শেষ অধ্যায়

ভ্রমর

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া : ১৩৬৬

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলী লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক :
সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
দি নিউ প্রাইমা প্রেস
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

এ রচনাটিকে যথার্থ উপন্যাস বলা চলে না। হয় তো হয়ে উঠতে পারতো একটি নাটক। তাও হয়নি। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে, জুড়ে দেওয়া সংলাপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে একটি কাহিনী। জানি না এটাকে দ্রুত-লিখন রীতির একটি অভিনব নমুনা বলা যায় কী না। তবে আমার দিক থেকে এটিকে কোন নবরীতির প্রবর্তনের দাবী নেই। মোট কথা, একটি গল্পকে ভিন্ন ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকাবৃন্দের যদি গল্প পাঠের তৃষ্ণা মেটাতে পেরে থাকি, তা হলেই সার্থক মনে করব।

ভ্রমর

জগত্ সংসারের সব কিছুই যে মায়াময় প্রপঞ্চক, এ কথা আমি আপনাদের প্রথম থেকেই শুনিয়ে আসছি। কথাটি আমার নিজের সৃষ্ট নয়। এই অবিনশ্বর সংসারের সকল কিছুই যে ক্ষণিকের মায়া মাত্র, আপনারা মানবজাতি আজকাল আগেই তা অনুভব করেছেন। আর আমি তো সামান্য এক ভ্রমর, পতঙ্গ মাত্র। এক ঝড়ের ঝাপটাতেই. যে-কোন মুহূর্তে আমার জীবনলীলা সাঙ্গ হতে পারে। এক্ষেত্রে, মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে। আপনারা বা আমি, কেউই নশ্বরতা নিয়ে জন্মাই নি।

কিন্তু এ কথাটা মনে রেখে, আপনারা যেমন মানব জীবন ধারণ করতে পারেন না, আমি পতঙ্গ হয়েও তা পারি না। প্রপঞ্চক মায়াময়তার এটাও একটা লক্ষণীয় দিক। যতক্ষণ ডানা মেলে গুনগুন করে ফিরছি, ততক্ষণ অবিনশ্বরতার কথা আমিই কি মনে রাখি? আপনারাও কি রাখেন?

সম্ভব নয়। সেই অবকাশ কোথায়? আমার পতঙ্গ জীবনটা তবু বিশেষ সীমাবদ্ধতায় বাঁধা। মানুষের জীবনের মতো ব্যাপক বিপুল বিচরণের ক্ষেত্র আমার নয়। বিচরণ বলতে মানুষের আচরণ, ভোগ, সুখ-দুঃখ-শোক, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তীব্র বেগে ছুটে বেড়াবার কথা

বলছি। আপনাদের দেখে, অর্থাৎ মানুষকে দেখে, একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। তা হল, তারা একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ায় একসঙ্গে চেপে বেড়াতে চায়। নানা আকারের, নানা রঙের ঘোড়া। তার ফলে, কোন ঘোড়ারই একক আর প্রকৃত সওয়ার সে হয়ে উঠতে পারে না। আছাড় খায়, আঘাত পায়, হাহাকার করে, বিষণ্ণতায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

আমার এবম্বিধ মন্তব্যে কি আপনারা আহত হচ্ছেন? তাহলে আর বলব না। বরং অনুরোধ করব, নিজেরাই নিজেদের জীবনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। না, নিতান্ত মার্কাবি লাগানো কাঁচের আয়নায় সাজগোজ দেখার জন্য নয়। একবার মনের আরশীটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখুন। হয়তো আমার কথার সত্যতা উপলব্ধ হতে পারে।

আমার একটা দোষ, সব কিছুতেই দার্শনিকতাকে টেনে আনি। আসলে আমি দার্শনিক নই। জীবদের কথা বলতে গেলেই, এ রকম নানা সব কথা আমার পাখার ঝাপটায় গুনগুনিয়ে ওঠে। ভ্রমরের বেয়াদপি মাফ করবেন। জীবজগতের সকল কিছুই যে মায়াময় প্রপঞ্চক, এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছি।

যাঁরা এ কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন, বিশ্বাস করবার কারণ আছে, তাঁরা এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে, মানুষের আঁতুর হিসাবে জন্মাতে দেখেছিলেন। এই গ্রহে যখন মানুষের জন্ম হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠছিল, তখনই তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, এই গ্রহ একটি কর্দমাক্ত বরাহের ন্যায় দর্শিত হয়েছিল। মহাপ্লাবনের পরে, এই গ্রহ যখন আপন রূপ ধারণ করছিল, তখন জল এবং কাদার গোলাকার পিণ্ডটি নানা ভাবে এই রূপ ধারণ করেছিল। জন্মলগ্নে যাঁরা এই গ্রহকে দেখেছেন, তাঁরা সকলেই এক মহাপ্লাবনের কথা বলেছেন। বাইবেল বলুন, পুরাণ বলুন, এমন কি সাঁওতাল জাতির জগত জন্মের কাহিনী বলুন, প্লাবনের কথা কথা সকলেই বলেছেন।

যাঁরা এই গ্রহকে তার উষাকাল থেকে দেখে এসেছেন, তাঁরা এই গ্রহের ও গ্রহের জীবদের পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব এই জগতীতলে সব কিছুই যদি নশ্বর নয়, তবে এই মানব জন্মের ফল কি ? এই চিন্তা থেকে তাঁরা মোক্ষলাভের পরিণামকেই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেছেন।

এইবার ভেবে দেখুন, কার কিসে মোক্ষলাভ ? আপনারা জীবনের যে মোক্ষলাভের কথা চিন্তা করে চলেছেন, তার রূপ আলাদা। ঋষি বা মহামানবের মোক্ষ আপনার মোক্ষ নয়। যদি হত, তবে এই জগতের চেহারা অন্য রকম হত। তাই নয় কি ? কিন্তু আবার আমি দার্শনিকতার ফুট কাটতে আরম্ভ করেছি। নিজের পতঙ্গ জীবনটার কথা আমি বারে বারেই ভুলে যাই। এ সব কথা থাক। জীবনের মায়াময় প্রপঞ্চকতার একটি অধ্যায়ে আমি আপনাদের নিয়ে যেতে চাই। আসুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাদের যেখানে নিয়ে যেতে চাই, সেখানে আমি সর্বদা গুনগুন করব না। আমি আপনাদের সেখানে উপস্থিত করব দর্শক আর শ্রোতার মতো। আপনারা দেখে যান, আর শুনে যান। আমি মাঝে মাঝে আপনাদের হারিয়ে যাওয়া সূত্রকে ধরে দেব।

ভ্রমর এবার আপনাদের কাছে সূত্রধরের ভূমিকা গ্রহণ করছে।

স্থানটিকে গঞ্জ বা বন্দর বলা যায়, অথবা বন্দর গঞ্জ মিলিয়ে। বিশাল নদী, যার পরপার চোখে পড়ে না। এই সব নদীর হাত থেকে জমিকে রক্ষা করার জন্য আছে উঁচু বাঁধ। নদীর আঁকাবাঁকা গতির সঙ্গে, সুদীর্ঘ বাঁধ। এই সব গঞ্জে যদিও সাধারণ ভাবে হাটবাজার হয়,

আসলে বড় বড় ব্যবসায়ী আড়তদারেরা এখান থেকে দেশে দেশান্তরে জলপথে শস্য চালান দেয়। এই সব আড়তদারদের বিভিন্ন ভূমিকা। কাছাকাছি সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে এরা এক একজন বিরাট ভূস্বামী জোতদার, মহাজনী কারবার করে। তার সঙ্গে গঞ্জে শস্য গুদামজাত করে, বিরাট আড়ত চালায়, নিজেরাই দূর দূরান্তরে জলপথে মাল চালান দেয়। অর্থাৎ আয়ের সবটাই নিজেদের হাতে।

এদের মুকুটহীন রাজা বলা চলে। দোর্দণ্ড এদের প্রতাপ। অধিকাংশই অশিক্ষিত, চরিত্রহীন, টাকার জন্য সবই করতে পারে। কিন্তু এদের রুচি নেই। বিত্তশালীদের মতো জামা কাপড় পরে শালীন হতে জানে না। অথচ কোমরের কষিতে ক্যাশ লক্ষ টাকা থাকে।

প্রচুর মালবাহী ঘুটান নৌকার সঙ্গে এদের বজরার তুলা, ভিতরে খাওয়া থাকা শোয়ার মতো ঘর থাকে। এই সব নৌকা বা বজরা প্রায় সময়েই দশ বা বারো মাল্লাই হয়। মাঝিদের ব্যবস্থা সবই আলাদা। হতদরিদ্র এই সব মাঝিরা, বিশাল মালবাহী, বসবাসকারী নৌকার সঙ্গে কাছিতে বাঁধা একটি জেলে ডিঙ্গিতে নিজেদের রান্নাবান্না করে। মালিকের সীমানায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। নিতান্ত কাজ-কর্মের প্রয়োজন ছাড়া।

এই রকম একটি নদীর ধারে, বিশাল গঞ্জের তীরে ছোটখাট অনেক নৌকা ভাসছে। আকাশটাকে যেন অনেকগুলো নৌকার মাস্তুল খোঁচা দিচ্ছে। গঞ্জের এক প্রান্তে লঞ্চ ঘাট। এইমাত্র দাক্ষিণাঞ্চল থেকে একটি লঞ্চ এসে ভিড়ল। লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে যাত্রীদের

ওঠা-নামার চিৎকার চেঁচামেচি। গোটা মুখ ঘোমটায় ঢাকা কলাবউ থেকে বৃদ্ধা, নানা রকমের গ্রামীন যাত্রী, কারোর হাতে হাঁস, পায়রা, কারোর বা ছাগলছানা, মালপত্তর তো আছেই।

লঞ্চের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। খালাসী কাঠের পাটাতনের পুল তুলে নেবার জন্য যাত্রীদের কেবলই তাড়া দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে।

আজ হাটের দিন নয়। না হলেও গঞ্জ বেশ সরগরম। হাটের দিন কাক চিলের চিৎকারের মতো কান পাতা যায় না। ঘাটে নৌকার ভিড়ও অনেক বেশী থাকে। লোকের তো কথাই নেই।

আজ এখন নৌকায় তরি-তরকারি, খাসী, পাঁঠা, শুকনো মাছ নানা কিছু উঠছে, তার জন্য ব্যস্ততা চিৎকারও কম নেই।

বজরাতুল্য বিশাল মালবাহী নৌকায় শত শত মন শস্যের বস্তা উঠছে। মালিক কালীচরণ। কালীচরণ লোকটি উল্লিখিত সেই জাতীয়, ধনবান, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। হাঁটুর কাছে তোলা একটা ধুতি। বুকে বোতাম না-লাগানো একটা হাফ শার্ট। বুকে একটা সোনার চেনের সঙ্গে মাদুলী ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। লকেটে মা কালীর ছবিটা স্পষ্ট। কালীচরণ বয়সে প্রৌঢ় হলেও, এখনও বেশ শক্ত পোক্ত চেহারা। মাথার চুল ধূসর, চোখ সর্বদাই লাল। দেখলেই অহংকারী মনে হয়।

বাঁধের ঢালুতে একটা বিরাট হিজল গাছের নিচে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সে শ্যেন চক্ষে মাল তোলা দেখছে। প্রত্যেকটি বস্তুবাহী কুলি তার হাতে একটি করে কাটি দিয়ে যাচ্ছে। এই কাটিগুলো আড়তের কর্মচারী কুলির হাতে দিয়ে দেয়। কালীচরণ সেগুলো নিয়ে, নিচে মাদুর পেতে বসা গোমস্তার সামনে ফেলে দিচ্ছে। চশমা চোখে দরিদ্র গোমস্তা লোকটি খাতায় হিসাব লিখছে। এবং লোকটি কোন রকম অন্যমনস্ক হলে কালীচরণের ধমক—'এই, ওদিকে কি দেখছ হে? ওদিকে তোমার কোন্ সুমুন্দি, তার ছুক্রি বোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাঁ?'

লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কালীচরণের লক্ষ্য নৌকার দিকেও। মাল ঠিক সাজিয়ে রাখা হচ্ছে কিনা। অপছন্দ হলেই গালাগাল দিচ্ছে, 'এই, এই শালারা, এ কি কয়লার গোলায় কয়লা ঢালা হচ্ছে, অ্যাঁ? একটু সাজিয়ে থাক্ দিতে কি হাতে পোকা পড়ে!'

লোকগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

আড়ত থেকে মাল আনবার পথে কালীচরণের দুই ছেলেও মাঝ পথে আছে। মাঝখানে অধিষ্ঠান করছে তার ছোট ছেলে শম্ভু। তাগড়া যোয়ান ছেলে, কিন্তু আঁটসাঁট প্যান্ট শার্ট পরা। ইতিমধ্যেই কিছুটা ভুঁড়ি হয়েছে। শার্টের বুকের বোতাম খোলা। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তার গলায়ও একটা সোনার চেন, লকেটে একটা চৌকো মাদুলীর সঙ্গে বেশ বড় আর ধারালো বাঘের নখ ঝুলছে। সে সিগারেট টানছে। ডান হাতে ঘড়ি।

শম্ভুর পাশে প্রায় তার বয়সীই একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, শম্ভুরই ছেঁড়া ময়লা জামা প্যান্ট ওর গায়ে। রোগা চেহারাটা এমনিতে খারাপ না। কিন্তু চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, গালে একটা কাটা দাগ, খালি পা। ছেলেটার গলায় অঁক অঁক করে শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর ওর সতৃষ্ণ নয়ন শম্ভুর সিগারেট টানার দিকে। শম্ভু সিগারেট টানলে ও ঢোক গিলছে। শম্ভু ধোঁয়া ছাড়লে, ওর মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটের কষে লালা।

শম্ভুর সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই, সে মাল তোলার দিকেই লক্ষ্য রাখছে আর সিগারেট টেনে যাচ্ছে

ছেলেটা আর থাকতে না পেরে শম্ভুর গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত ছোঁয়ায়, শব্দ করে, 'অঁই অঁই-আঁ, অঁই অঁই—' তারপরে সিগারেট টানার হুস্ হুস্ শব্দ করে, দাঁত বের করে হাসে।

শম্ভু রেগে যায়, 'এ হাবা শালার জন্মে মাইরি সিগ্রেট খাবারই উপায় নেই। যেন ওর বাপ গত জন্মে আমার কাছে ওর সারা জীবনের সিগ্রেট জমা রেখে গেছলো। মারব শালা এক ঝাড়।' হাত তোলে।

হাবা মাথা কাত করে সরে যায়। গলায় শব্দ করে, 'আঁহ্ আঁহ্' ...খোশামোদ করে হাসে।

শম্ভুর সিগারেট তখন প্রায় শেষ তবু আর একটা টান দিয়ে, জ্বলন্ত সিগারেটটা হাবার দিকে ছুড়ে দেয়। হাবা সেটা দু'হাতে লুফে নিয়ে, আগুন বাঁচিয়ে, চপ্ চপ্ শব্দ সিগারেটে টান দেয়, আর ধোঁয়া ছাড়ে, তার চোখে মুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

আড়তের বারান্দায় একটি টেবিলের সামনে বসে ছিল শঙ্কর, কালীচরণের বড় ছেলে। তার পোশাক-আশাক অনেকটা শালীন। পায়জামা, পাঞ্জাবী তার গায়ে। গুরুপাঞ্জাবীর কলারে ও বোতাম-পটিতে রঙীন সুতোর কাজ করা। বাতাসে চুল উড়ছে। সে হিসাব নিয়ে বসেছে। তার জামার বুকের বোতাম খোলা। তারও গলায় চেন, লকেটে ধ্যানী বুদ্ধের ছোট মূর্তি।

ঘরের ভিতরে গদীর ওপর বসে, একজন ক্যাশ বাক্সো সামনে রেখে, ছোট ছোট চিরকূট দেখছে, আর এক একটি সংখ্যা বলতে বলতে টাকা গুনছে। শঙ্কর লিখে নিচ্ছে।

কর্মচারি: 'গুঁইরাম সাপুই, জমা সাতাত্তর টাকা আশি পয়সা... গঙ্গাধর মাইতি, দুশো তিন টাকা পাঁচ পয়সা...'

শঙ্কর আপন মনে লিখতে লিখতে কর্মচারিটির কাছ থেকে আওয়াজ না পেয়ে একটু পরে অবাক চোখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কর্মচারিটি, দরিদ্র কিন্তু ভদ্র, সংকুচিত বিব্রত হেসে, হাত জোড় করে, শঙ্করের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শঙ্কর ঃ 'কি হল? ক্যাশ মেলানো শেষ হয়ে গেল?'

লোকটি হাত কচলিয়েঃ 'আজ্ঞে না বড়দাবাবু, আপনাকে সেই যে পরশু বলেছিলাম একটা কথা—'

'পরশু? কি কথা বলুন তো?'

'সেই যে সাতাশ টাকা তিরিশ পয়সা! দোহাই আপনার বড়দাবাবু, গরীব মানুষ, সাতাশ টাকা তিরিশ পয়সা আমার কাছে অনেকখানি। ধনে প্রাণে মারা যাব। আর কর্তাবাবু শুনলে, আমাকে কাঁচা খাবে। আমার কথায় বিশ্বাসই করবে না।'

'আপনি হলেন খাজাঞ্চি, ক্যাশের টাকা না মেলাতে পারলে, আমি কি করব বলুন?'

'খুব সত্যি কথা বড়দাবাবু, কিন্তু দেখুন, আমার তো এ রকম হয় না। হিসাবে আমি গরমিল কিছু করি নি। আমারই অসাবধানে টাকাটা কেউ সরিয়েছে।'

'তা এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন?'

'আপনি ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানে না। ছোড়দাবাবু জানলে, কর্তার কানে উঠে যেত। আপনি ওই সাতাশ টাকাটা হিসেব থেকে একদম বাতিল করে দিলেই আমি রেহাই পেয়ে যাই।'

'সেটা তো অন্যায়, অসততা খাজাঞ্চিবাবু। টাকাটা যেন কে দিয়েছিল?'

'গড়াই মাহাতো।'

'আর সেই টাকা আপনি হিসাব থেকে বাতিল করতে বলছেন? বাবাকে আপনি চেনেন না? গড়াই মাহাতোর সঙ্গে বাবার কথা হবেই। জানেন তো, বাবার হিসাব জ্ঞান কেমন টনটনে। আপনাকে তো অবিশ্বাস করবেই, জানাজানি হলে আমাকেও অবিশ্বাস করবে।'

'তা হলে এখন উপায়?'

'উপায় একটাই আছে। হিসাবের খাতায় বাতিল করা যাবে না।'

সে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একগোছা টাকা বের করে, তিনটি দশটাকার নোট খাজাঞ্চিকে বাড়িয়ে দিল।

'নিন, আমার পকেট থেকেই দিচ্ছি। এ টাকা ভাঙিয়ে, সাতাশ টাকা তিরিশ পয়সা জমা করে, বাকিটা আমাকে দিয়ে দিন।'

লোকটি কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। এগিয়ে এসে শঙ্করের দু'হাত চেপে ধরল।

'বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, নইলে আপনার পায়ে পড়তাম।'

'ছি ছি, এ সব কি বলছেন আপনি? আমি যা পারলাম, তাই করলাম।'

হঠাৎ একটা চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। দেখা গেল একটি কুলির মাথার বস্তা ফেটে গিয়ে ঝর ঝর করে চাল পড়ে যাচ্ছে। একটি যুবতী ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই চাল তুলে নিচ্ছে।

শম্ভু চিৎকার করে, 'এই হেবো, ছুঁড়িকে ধরত, কেড়ে নে সব চাল।'

হাবা অত্যন্ত অশালীন ভাবে যুবতীকে চেপে ধরে। শম্ভু গিয়ে, মেয়েটার কোমরের কোঁচড় কাপড়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিতে।

শম্ভু: 'দে, বের কর চাল।'

মেয়েটা চিৎকার করে: 'কুড়িয়ে নিয়েছি তো, ও রকম গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? ভাগাড়ের মড়া পেয়েছ আমাকে?'

হাবা অঁক অঁক শব্দ করে। শম্ভু মেয়েটিকে মারতে উদ্যত হয়, চুল ধরে টানে। মেয়েটি চিৎকার করে। শঙ্কর ছুটে আসে।

শঙ্কর: 'এই শম্ভু, কি হচ্ছে? ছাড়, ছেড়ে দে। ও ক'টা চাল নিলে কি হবে?'

শঙ্করের কথায় কান দিতে যেতে, শম্ভু আর হাবার হাত শিথিল হয়। মেয়েটা দৌড়ে পালায়। আশেপাশে কয়েকজন হাসাহাসি করে। কুলিটা তখন বস্তা নামিয়ে ছেঁড়া মুখ বন্ধ করে। শম্ভু তাকেই তেড়ে যায়।

শম্ভু: 'ব্যাটাচ্ছেলে, বস্তা দেখে শুনে নিতে পারিস না?'

হাবা মাটি থেকে চাল কুড়োয়।

কালীচরণ হিজল গাছের নিচে থেকে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে একটু একটু মেঘ জমছে।

অন্য পাশে দুটি লোক, ছোট-খাটো ব্যবসায়ী, নিজেদের মধ্যে কালীচরণকে দেখিয়ে আলোচনা করে।

১ম : 'একেই বলে লক্ষ্মীর বরপুত্র।'

২য় : 'কে?'

১ম : 'কালীচরণের কথা বলছি। মেঘ ফেটে রোদ যাকে বলে, তেমনি কপাল। কথায় বলে ভাগ্যিবানের বউ মরে। কালীচরণের বেলাতেও তাই।'

২য় : 'ভাগ্যিবানই বটে। ব্যাটা লম্পট, হাটে বাজারে মেয়েছেলে নিয়ে র‍্যালা করে।'

১ম : 'আহা, ওকেই তো ভাগ্যি বলে হে। তারপরে দ্যাখ, অমন দুটি যোয়ান ছেলে।'

২য় : 'বড় ছেলেটা অবিশ্যি ভালো। ছোটটার তো গুণে নুন দেবার জায়গা নেই। বাপের চরিত্তির পেয়েছে।'

১ম : 'তা পাক, তবু বাপের ব্যাটা তো! আর ব্যবসার তো কথাই নেই। এ গঞ্জে কালীচরণের মতো এত বড় আড়তদার এখন আর ক'টা আছে? বলতে গেলে কালীচরণ এখন মস্ত সওদাগর।'

২য় : 'কিন্তু মহাপাপী। এ গ্রাম গঞ্জের কে না জানে, কার সব্বোনাশ করে কালীচরণ আজ এত বড় ব্যবসার মালিক।'

১ম : 'আহা, ও কথা বলে আর এখন কি লাভ? পাপ না করে কে কবে বড়লোক হয়েছে।'

কালীচরণ হাঁক দেয়, 'আর দেরি করা যাবে না, বাতাস ছেড়েছে, তাড়াতাড়ি কর। এই গোনেই নৌকো ছেড়ে দিতে হবে। ওরে শস্তে! শঙ্করা! তোরা চলে আয়।'

কালীচরণের তাড়ায়, কুলিরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়ায়। মাঝিরা মাস্তুলের ওপর পাল খাটাতে ব্যস্ত হয়, নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে কথা বলে।

শম্ভু আড়তের দিকে ছুটে যায়। আড়তের কর্মচারি ঘোষণা করে. 'মাল সব তোলা হয়ে গেছে।'

শম্ভু গুদামের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে ছুট লাগায়।

শঙ্কর খাতা বগলে নদীর ধারের দিকে দৌড় দেয়।

কালীচরণের চিৎকার শোনা যায়, 'আর দেরি নয়, পাল তোল। নোঙর খোল।'

নৌকার গায়ের সঙ্গে কাঠের পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে আগে কালীচরণ ওঠে। মাঝিরা কেউ নোঙর তোলে, কেউ পাল খাটাতে ব্যস্ত হয়।

শম্ভু পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, মুখের সিগারেটের শেষাংশ হাবার হাতে গুঁজে দেয়, 'শালা!'

হাবা খুশি হেসে সিগারেটে চপ্ চপ্ করে টান দেয়।

শঙ্কর পাটাতনের সিঁড়িতে পা দেয়।

দূর থেকে একটি মেয়ের স্বর ভেসে আসে: 'ওগো বাবুরা, একটু দাঁড়াও গো!…তোমাদের নৌকোয় আমাকে একটু নিয়ে যাও।'…

শঙ্কর দূরের বাঁধের দিকে তাকায়। একটি মেয়েকে ছুটে আসতে দেখে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। বগলে একটি ছোট পুঁটলি। তার পিছনে আকাশ। সে কালীচরণের নৌকার দিকে হাত তুলে দাঁড়াবার ইশারা করছে।

কালীচরণ: 'এই শঙ্কর, তাড়াতাড়ি উঠে আয়। ও সব ডাকিনীর মায়া, যাত্রার সময় পেছু ডাকছে, অকল্যেণ! উঠে আয়।'

শঙ্কর পায়ে পায়ে ওঠে।

বাঁধের ওপর দিয়ে মেয়েটি ছুটে আসছে, চিৎকার করছে: 'ওগো দোহাই তোমাদের, একটু দাঁড়াও! আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।'…

শম্ভু: 'এই মাঝি, ব্যাটা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? সিঁড়ি তোল।'

কালীচরণ: 'শালা মায়ের সাঙা দেখছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি তোল। ওহে, তোমরা দাঁড়ে বস হে সবাই।'

শঙ্কর : 'কী ব্যাপার একবার দেখলে হত না? অমন করে একটা মেয়ে ছুটে আসছে।'

কালীচরণ : 'না না, ও সব দেখাদেখির কিছু নেই। যাত্রার মুখে পিছু ডাক মানেই অকল্যাণ।'

শম্ভু : 'কি রে দাদা, ছুঁড়ি দেখে তোর চোখে খোয়াব লেগে গেল না কি?'

হাবা আঁ্যামা আঁ্যামা করে অদ্ভুত স্বরে হাসে।

শঙ্কর (শম্ভুকে) : 'বাজে কথা বললে মারব এক থাপ্পড়।'

শম্ভু দাঁত বের করে হাসে।

সিঁড়িটা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়। মাঝিরা একসঙ্গে হাঁক দেয়, 'জয়মা দুগ্‌গা, দুগ্‌গতি নাশিনী জয়মা গঙ্গা।'

বাঁধের ওপর মেয়েটি অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। দ্রুত ঢালুতে নেমে পড়ে, করুণ আর্তস্বরে ডাকে : 'ওগো বাবুরা, দোহাই তোমাদের পায়ে পড়ি গো, আমাকে তোমাদের নৌকোয় নিয়ে নাও। ওপারে গিয়ে যেখানে খুশি নাবিয়ে দিও।'

মেয়েটি জলের ধারে এসে পড়ে।

কালীচরণ (হাঁক দেয়) : 'মাঝিরা, নৌকো ছাড়ো, কোন দিকে দেখবে না। শালা, যাত্রার মুখে পেছু ডাক।'

একজন মাঝি : 'পালের কানদা ধরে টান মারো হে।'

নৌকার মুখ ঘুরে যায়, নদীর বুকে এগিয়ে যায়।

শঙ্কর : 'বাবা, ওই তো একটা প্রাণী, নিয়েই—'

কালীচরণ : 'চোপ! আমার হুকুম। ওহে, নৌকো চালাও, দাঁড় মারো।'

মেয়েটি একেবারে জলের ধারে এসে পড়ে, পায়ের গোছ পর্যন্ত পাঁকের গভীরে ডুবে যায়। মেয়েটি : 'ভগবান তোমাদের ভালো করবেন, দয়া করে আমাকে নিয়ে যাও বাবুরা। আমার দিকে একবার দেখ। যার তার নৌকোয় উঠতে আমার সাহসে কুলোয় না। তোমরা ভালো মানুষ—।'

শম্ভু: 'না না, আমরা অমানুষ। আমাদের মায়া ধর্ম নেই।'

হাবা অদ্ভুত শব্দে হাত নেড়ে কোমর দুলিয়ে মেয়েটিকে হম্বি তম্বি করে।

কালীচরণ: 'জোর বাও হে মাঝিরা। আমি নিজে গিয়ে হালে বসছি। ও সব হচ্ছে ডাকিনীর মায়া।'

সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যায়।

ঝপাং শব্দে মেয়েটি পুঁটলিসহ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল থেকেই হাত তুলে চিৎকার করে: 'ওগো দোহাই তোমাদের— ।'

শঙ্কর: 'বাবা!'

মেয়েটি চিৎকার করে: 'আমি সাঁতার জানি না বাবুরা ডুবে যাব।' সে হাবুডুবু খায়।

কালীচরণ: 'মর বেটি!'

শঙ্কর আর থাকতে পারে না, একটা মোটা দড়ি মেয়েটির দিকে ছুড়ে দেয়, বলে, 'দড়িটা জোর করে ধর, আমি টেনে তুলছি।'

কালীচরণ (ধমকিয়ে): 'শঙ্করা! কী হচ্ছে?'

শঙ্কর বাবার দিকে তাকায় না। মেয়েটি দড়ি ধরে পুঁটলির সঙ্গে জড়িয়ে নেয়। শঙ্কর মেয়েটিকে নৌকোর কাছে টেনে আনে।

শম্ভু হেসে গেয়ে ওঠে:

'ফুলের গন্ধে মাতাল হলে,
ভোমরা কেমন গুণগুণায়
ওরে ভাই যৌবন কেমন কুড়কুড়ায়।'

হাবা কি বোঝে কে জানে, সে হাততালি দেয়।

মাঝিরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে।

শঙ্কর মেয়েটিকে নৌকার কাছে টেনে আনে: 'শক্ত করে ধর, তোমাকে আমি টেনে তুলব।'

কালীচরণ (হাসে) বলে, 'হারামজাদার কাণ্ড দেখছ? ছুঁড়ির গতর আর চাঁদপানা মুখ দেখে ব্যাটা আমাকে পর্যন্ত গণ্যি করলে না?'...

শঙ্কর দড়িসহ মেয়েটিকে খানিকটা তুলে তার একটি হাত চেপে ধরে। মেয়েটিও তার হাত ধরে। শঙ্কর তার সর্বশক্তি দিয়ে এক হ্যাঁচকায় মেয়েটিকে নৌকার ওপর বুকের কাছে তুলে নেয়।

মেয়েটি পুঁটলিসহ, শঙ্করের গায়ের স্পর্শ থেকে একটু সরে যায়।

কালীচরণ মেয়েটির ভেজা যৌবনোচ্ছলিত শরীরের দিকে লুব্ধ চোখে তাকায়।

শম্ভুও একই চোখে তাকায: 'দাদা আমার সোনালী মাছ ধরেছে, কেটে খাব।'

শঙ্কর শম্ভুর দিকে রুখে ধাবিত হয়। শম্ভু দাঁড়িদের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে। হাবা ভয় পেয়ে আঁক আক করে ওঠে।

কালীচরণ: 'এই—এই মেয়ে! হতচ্ছাড়ি, লক্ষ্মীছাড়ি! পেছু-ডাকিনী, যাও ভেতরে যাও। ওই গতর নিয়ে পাকা ফলের মতন সকলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হবে না।'

শঙ্কর: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ওই ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে যাও। শুকনো কাপড় তো নেই। চল, আমিই একটা কাপড় দিচ্ছি।'

মেয়েটি ভিতরে ঢুকে যায়। শঙ্কর পিছনে ঢোকে। কালীচরণ হালের পাশে হাল মাঝিকে বলে, 'দয়া, ছেলের আমার বড় দয়ার পরাণ। এইজন্যে আমাদের ঘরে লেখাপড়া শেখাতে নেই। শেখালেই শালা দৈত্যের ঘরে পেহ্লাদ হয়ে যায়।'

শম্ভু অবাক লুব্ধ চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'মারহাবা, সোনালী মৎসপরীটাকে নিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে!'

হাবা কি ভাবল, আঁউ আঁউ শব্দ করে শম্ভুর গায়ে খোঁচা দিয়ে বন্ধ দরজার দিকে দেখাল।

শম্ভু: 'কি বলছিস?'

হাবা গলায় অদ্ভুত শব্দ করে, দু'হাত দিয়ে শম্ভুকে জড়িয়ে ধরে আদরের ভঙ্গি করল। শম্ভু হৈ হৈ করে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, 'ছাড় শালা, ছাড়। আমি কি খুবসুরত্ ছুকরি নাকি?'

* * *

নৌকার বন্ধ দরজার ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। রীতিমত বড় ঘর। একপাশে বিছানা থাক দিয়ে সাজানো। অন্য পাশে আলনায় পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবী, প্যান্ট-শার্ট। আর একদিকে একটি ছোট-খাটো কাঠের আড়ালের ওধারে একটি তোলা উনোন, রান্নার ডেওয়া ঢাকনা থালা বাসন, আর ছোটখাটো একটি স্টোর, যেখানে চাল ডাল তেল, কাঁচা আনাজপাতি বাজার ইত্যাদি রয়েছে। অন্য পাশে জলের কলসী, শিল-নোড়া, বালতি। সেদিকেই একটি জানালাও আছে। জানালা দিয়ে নদীর বুক চোখে পড়ে। অন্য দিকেও জানালা আছে। সেই জানালার পাল্লাগুলো এখন ঢাকা দেওয়া। মেয়েটি ঘরের একপ্রান্তে বুকের কাছে পুঁটলিটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার সংক্ষিপ্ত ভেজা কাপড়ে, উদ্ভিন্নযৌবন কিছুমাত্র চাপা পড়ে নি। চোখে তার দ্বিধা সংশয়, দৃষ্টি শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর আলনার কাছে এগিয়ে যায়। কাপড় চোপড় ঘাঁটে, মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়। চোখে চিন্তিত, জিজ্ঞাসা।

মেয়েটি যেন আরো সংকুচিত জড়োসড়ো হয়ে পড়ে।

শঙ্কর বলে, 'এখানে মেয়েমানুষ নেই, শাড়ি-টাড়িও নেই। ধুতি দিতে পারি।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়।

শঙ্কর ভুরু কোঁচকায়ঃ 'তোমার ওই পুঁটলিতে কি আছে?'

মেয়েটি যেন ভয় পেয়ে পুঁটলিটা পিছনে সরিয়ে নেয়, তার ভেজা কাপড়ে ঢাকা উদ্ধত বুক দেখা যায়। আবার তৎক্ষণাৎ সে একটা হাত বুকের ওপর রাখে।

মেয়েটি ভয় ত্রস্ত স্বরে বলে, 'কি আবার থাকবে? আমার দু-একটা জামা কাপড় আছে।'

শঙ্কর হাসেঃ 'আরে আমি তো সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম, তোমার পুঁটলির জামা কাপড় তো সবই ভিজে গেছে। আমি একটা ধুতি দিলে, জামা পাবে কোথায়? শুধু ধুতি পরে থাকতে পারবে?'

মেয়েটির চোখে মুখে লজ্জা ফুটে ওঠে, ঠোঁটের কোণে একটু হাসে, বলে, 'তোমার একটা জামা দাও না. তাই পরব।'

শঙ্কর হো হো করে হেসে উঠল। মেয়েটি ভুরু কোঁচকাল।

শঙ্কর একটি চওড়া পাড়ের পাট করা ধুতি মেয়েটির দিকে ছুড়ে দিল : 'এই এখন গুছিয়ে নিয়ে পর।'

মেয়েটি ধুতিটা লুফে নেয়।

বাইরে উঁচুতে হালের পাশে কালীচরণ। হালের ডানাটা ময়ূরের পেখমের মতো, ছ'পাশে মোটা হাতল। চটের ওপর রঙীন ফুলের কাজ করা আসনের ওপর সে বসে আছে। কালীচরণের পায়ের কাছে আসল হাল মাঝি কল্‌কেতে তামাক সাজছে। নৌকা এখন মাঝ নদীতে। তীর দূরে সরে যাচ্ছে, গঞ্জের কোলাহল শোনা যায় না। গঞ্জটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে।

কালীচরণ বলে ওঠে. 'নাঃ, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না।'

হাল মাঝি : 'কোন্ ব্যাপারটা কত্তা? মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটার ঘরে ঢোকা?'

কালীচরণ চমকায়, বন্ধ দরজার দিকে তাকায় : 'না না, সে আমার বড় ছেলেকে আমি জানি, ও কি করবে? লেখাপড়া শেখে যারা. সেগুলো ভ্যাড়া হয়। হ্যাঁ শম্ভু হলে এতক্ষণে ঘরের ভেতর একটা কেলেংকারি করে ছাড়ত।'

হাল মাঝি : 'তবে আর ভাবনা কি কত্তা?'

কালীচরণ : 'আমি ভাবছি ছুঁড়ির ব্যাপারটা। চেহারা দেখলে অবশ্য মন মজে যায়। কিন্তু যাত্রার মুখে এ রকম একটা ব্যাপার, মনটা খুঁত খুঁত করছে। সুন্দরবনের হাওয়া এখানে, বনবিবির মায়া-টায়া কিনা কে জানে?'

হাল মাঝি কল্‌কেটা হুঁকোর ডগায় বসিয়ে কালীচরণের দিকে এগিয়ে দেয়।

কালীচরণ চমকিয়ে ওঠে: 'অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও, ধোঁয়া টেনে একটু মগজটা সাফ করি।'

নীচে দাঁড়িদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শম্ভু সিগারেট টানছে, দৃষ্টি বন্ধ দরজার দিকে। কিন্তু হাবার দৃষ্টি সিগারেটের দিকে।

শম্ভু: 'দরজাটা যে খোলে না মাইরি। শালা আলিবাবার ডাকাতদের দরজা নাকি? দাদা আমার চিচিং ফাঁক মন্তর ভুলে গেল?'

হাবা বুক ফুলিয়ে দরজার দিকে যেতে উদ্যত হল।

শম্ভু: 'এই হেবো, কোথায় যাচ্ছিস?'

হাবা দরজায় পদঘাতের ভঙ্গি করল।

শম্ভু: 'ঝাড় খাবি শালা, এদিকে আয়।' হাতছানি দিয়ে ডাকে।

হাবা পিছিয়ে আসে, আঁ আঁ শব্দে সিগারেটের দিকে দেখায়।

শম্ভু (দাঁড়ি মাঝি একজনকে): 'দাদা কি নিজের হাতে মেয়েটাকে শুকনো কাপড় পরাচ্ছে?'

দাঁড়ি মাঝি: 'তা কি করে বলব বাবু, যেয়ি ছাখ না।'

শম্ভুর দৃষ্টি দরজার দিকে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার সিগারেটের ধোঁয়ার প্রতি হাবা নাকের পাটা ফুলিয়ে নিশ্বাস নেয়।

ঘরের ভিতরে মেয়েটি শঙ্করকে বলে, 'তুমি বাইরে যাবে না?'

শঙ্কর (দরজার দিকে এগোয়): 'যাব বৈকি, তা নইলে কি তোমার কাপড় ছাড়া দেখব?' যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, তোমার মুখটা চেনা চেনা লাগছে কেন বল তো?'

মেয়েটির চোখের কোণে বিদ্রূপ: 'ওটা তো ছেলেদের দস্তুর, মেয়ে দেখলেই চেনা চেনা লাগে।'

শঙ্কর বিব্রত, ঘরের পাটাতনের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে দরজার গায়ে হাত দিয়ে, পিছন ফিরে তাকায়।

মেয়েটি তখন নিচু হয়ে পুঁটলিটা রাখছিল। চকিতেই শঙ্করের দিকে তাকাল।

শঙ্করের চোখে চিন্তিত কৌতূহল: 'তোমার নামটা তো জানা হল না।'

মেয়েটি যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হল, 'আমার নাম?' একটু যেন ভেবে বলে, 'আমার নাম ময়না।'

শঙ্কর (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে): 'ময়না!' একটু হেসে বলল, 'তোমার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পাহাড়িয়া ময়না। এখন কোথা থেকে এলে?'

ময়না: 'আমি নিজেই জানি না কোথা থেকে এলাম।' (সহসা কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন): 'ভেজা জামা কাপড় আমার গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু'

শঙ্কর ব্যস্তভাবে দরজার হুড়কো খোলে: 'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও, কাপড়টা পরে নিয়ে খুলে দিও।'

শঙ্করকে বেরোতে দেখেই শম্ভু লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায়। হাবা বিকট স্বরে হাসে, আর মাথা চাপড়ায়! শঙ্কর রাগতভাবে শম্ভুর দিকে তাকায়।

শম্ভু: 'এতক্ষণ মজা মারলি, আবার রাগ দেখাচ্ছিস!'

শঙ্কর তেড়ে যায়, 'দেখবি রাসকেল? ছোটলোক কোথাকার!'

'আমি তো ছোটলোকই, তুই লেখাপড়া জানা দিগ্‌গজ, তা মেয়েটার গা মেপে দেখছিলি এতক্ষণ, না?'

শঙ্কর রীতিমত রেগে তেড়ে যায়। শম্ভু নিজের গুদাম ঘরে খোলা দরজা দিয়ে. মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

হাবা দাঁড়িদের পাশে সরে গিয়ে, অঁক অঁক শব্দ করে।

দাঁড়িরা যন্ত্রের মতো দাঁড় টানে, ঝপ্‌—ঝপ্‌—ঝপ্‌—ঝপ্‌।

শঙ্কর নীচের গুদাম ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'অসভ্য!'

শম্ভু গুদামের ভিতর থেকে গেয়ে ওঠে :

'দাদা আমার সভ্য বড়
মেয়ে পটাতে ভারি দড়—'

শঙ্কর এগিয়ে এসে হাবার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে বলে, 'এই ব্যাটা, আজ রান্না-বান্না নেই? বাটনা বাটতে হবে না? এখানে দাঁড়িয়ে খালি মজা মারলেই হবে?'

হাবা বন্ধ দরজার দিকে দেখিয়ে হাত নেড়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে ইশারা করে, অশোভন একটা ইঙ্গিত করে।

শঙ্কর হাত তুলে মারতে উদ্যত হয়।

'এই, এই শঙ্কর, ওকে মারছিস কেন? ওই হতচ্ছাড়ি মেয়েটা কাপড় পরে দরজা খুলুক, তারপরে ওকে দিয়ে রান্না করাবি।' কালীচরণ বলে ওঠে।

শঙ্করের আসল রাগটা শম্ভুর ওপরে। বলল, 'শম্ভেকে তুমি সাবধান করে দিও বাবা, জঘন্য নোংরা কথাবার্তা বলছে। এরপরে ওকে ধরে আমি পেটাব।'

কালী : 'কারোকে ধরে কারোর পেটাতে হবে না। যার যা ব্যবস্থা আমিই করব, আমি হলাম তোদের বাপ, তোদের শাসনকর্তা, —না কি বল হে সাঁইদার?'

হাল মাঝি কল্‌কের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'বটে কথাই তো।'

কালী : 'আমি যা বলব, তাই হবে।' চিৎকার করে ডাকে 'এই শম্ভে—শম্ভে—!'

শম্ভু গুদামের দরজা থেকে বেরিয়ে, নীচের পাটাতনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় : 'কি বলছ?'

কালী : 'তোকে বলেছিলাম না, নীচের গুদামে ইঁদুর মারার ওষুধ ছড়িয়ে দিতে?'

শম্ভু : 'বলেছিলে তো।'

কালী : 'তো, দিসনি কেন?' যা নীচে গিয়ে ইঁদুর মারার ওষুধ দিয়ে আয়।' তারপর আপন মনে বলে, 'শালা থলে জলে সবখানে ইঁদুর। রক্তবীজের ঝাড়, কত মারবে।'

ময়নার জামাবিহীন শাড়ি পরা শেষ হয়। সামান্য একটি ধুতিতে তার যৌবন আরও প্রকটিত। পুঁটলিটা ধরে তুলতেই, ঠক করে একটা ধারালো ভোজালির মতো ছুরি পড়ে যায়। ময়না চমকে সন্ত্রস্ত চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। দ্রুত হাতে ছুরিটা তুলে নেয়। পুঁটলির ভিতর থেকে ন্যাকড়া বের করে, ছুরিটার সারা গায়ে জড়িয়ে খুব সন্তর্পণে তলপেটের কাছে আস্তে গুঁজে রাখে। কাপড় দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা দিয়ে দেয় যেন বাইরে থেকে কিছুই বোঝা না যায়। তার পরে ভেজা পোশাক, আর পুঁটলির জামা কাপড় নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে।

মাঝিরা সকলেই ময়নার দিকে তাকায়। দাঁড়গুলো অসমান তালে পড়তে লাগে। ময়না সকলের দিকে দেখে। শম্ভু সামনে নেই।

শঙ্কর ময়নাকে দোচালার মতো ওপরের মাচা দেখিয়ে বলল : 'যা শুকোতে দেবে, মাচার কঞ্চির গায়ে শক্ত করে বেঁধে দিও, তা নইলে বাতাসে উড়ে যাবে।'

ময়নার খোলা চুল উড়ছে। ধুতিটাও বাতাসে শরীরে থাকতে চায় না যেন। চোখ ঘুরিয়ে বলে : 'ভাগ্যিস বললে!'

হালের সামনে কালীচরণ, দৃষ্টি ময়নার দিকে। বলে, 'এ শালা বনবিবির মায়া না হয়ে যায় না। ছুঁড়ির রূপ দেখেছ?'

মাঝি : 'ও কামিনীর রূপ, কাঞ্চনের জেল্লা কত্তা—দু'দিন বৈ তো নয়।'

কালী : 'তোমার মাথা ! কামিনীর রূপে আর কাঞ্চনের জেল্লায় আবার কখনও মরচে পড়ে নাকি ? হাল ধরা মাঝি, জীবনে আর কি দেখলে জানলে ?'

সে কল্‌কেটা মাঝির হাত থেকে নিয়ে, হুঁকোর ডগায় বসিয়ে, শোষণে চুম্বনে ধোঁয়া তোলে। ধোঁয়া বাতাসে ওড়ে।

কালী : 'এই শঙ্করা—যা, এবার হাবাকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা কর।'

ময়না তখন শরীর দুলিয়ে, এপাশ ওপাশ করে, মাচায় জামা কাপড় মেলছে।

হাবা ময়নাকে দেখছিল। শঙ্কর তার মাথায় আস্তে চাঁটি মারল, ভেতরের ঘরে যাবার সংকেত করল।

হাবা চমকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শঙ্কর তাকে অনুসরণ করল।

* * *

কালী ময়নাকে ডেকে বলে, 'এই মেয়েটা, এই! যাও, ভেতরে যাও।'

ময়না (হেসে) : 'বাইরের রোদে বেশ আরাম লাগছে।'

কালী : 'থাক, আর আরাম খেতে হবে না। যা একখানা হুরি মার্কা চেহারা করেছ, আমার নৌকোর বেবাক লোকগুলোকে তাহলে দানোয় পাবে।'

ময়না : 'আমি কি হুরি নাকি ?

কালী : 'হুরি না ডাকিনী কে জানে ? ওই ভয়ে নৌকোয় উঠতে দিতে চাই নি। যাও যাও, ভেতরে যাও।'

ময়না হেসে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

* * *

ঘরের ভিতরে রান্নাবান্নার অংশ। হাবা তোলা উনোনে কাঠ ধরাচ্ছে। শঙ্কর বঁটিতে আলু পেঁয়াজ কাটছে।

ময়না ভেতরে ঢোকে। শঙ্কর তাকায়।

ময়না : 'রান্না কি তোমরা কর নাকি?'

শঙ্কর : 'আমি, হাবা, আমরা সবাই মিলেই করি।'

ময়না : 'কেন, মাঝিরা রাঁধে না?'

শঙ্কর : 'না, মাঝিদের হাতের রান্না বাবা খায় না। হাবা ব্রাহ্মণের ছেলে, চুরি-চামারি করে না, আসলে ছেলেটা সৎ। দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসো।'

শঙ্কর আর ময়নাকে দেখে হাবা ওদের কথাবার্তা বোঝবার চেষ্টা করে। ইসারায় কী যেন বলে। ময়না ঘরের মসৃণ পাটাতনে উঠে আসে। হাবাকে দেখিয়ে বলে, 'ও কী বলছে?'

শঙ্কর : 'ও আমাকে উঠে তোমার কাছে যেতে বলছে। বলতে চাইছে, ও-ই সব করে নেবে।'

ময়না : 'ওর বুদ্ধি আছে তাহলে? ও কি সত্যি হাবা নাকি?'

শঙ্কর : 'হাবা বোবা, যা-ই বল, একটা কিছু। তবে আমাদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারে না।'

শঙ্কর উঠে দাঁড়ায়। ময়না দু'হাত মাথায় তুলে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।

শঙ্কর এগিয়ে আসে, অপলক চোখে ময়নাকে দেখে।

ময়না শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি দেখছ?'

শঙ্কর কোন জবাব না দিয়ে, দুটো জানালা খুলে দেয়।

জানালা দিয়ে একঝলক হাওয়া আসে। শঙ্কর গভীর কৌতূহল ও আবেগ নিয়ে ময়নার দিকে তাকায়। উনোনে লকলক করে আগুন জ্বলছে, হাবা আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে।

ময়না শঙ্করের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হয়ে যায়। চাদরের ওপর শুয়ে পড়ে বলে ওঠে, 'আহ্! ঘুম পাচ্ছে।'

শঙ্কর : 'একটা বালিশ দেব?'

ময়না : 'না না, অত সুখ সইবে না। তুমি আমাকে ও রকম করে কি দেখছ বলতো ?'

শঙ্কর : 'যদি বলি তোমার রূপ ?'

ময়না খিল খিল করে হেসে ওঠে : 'রূপ ! আমার !' (আবার খিল খিল করে সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসে)—'কার যেন একটা গান শুনেছিলাম—

আ রে প্রাণ ! রূপে কি করে
আমার মন মজেছে যারই সনে
প্রাণও চাহে তারে।'

আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।

শঙ্কর : 'যদি বলি আমার মনই মজেছে ?'

ময়না : 'তা মজতে পারে বটে। তুমি আমাকে কষ্ট করে নৌকোয় তুলেছ। কিন্তু আমার মন যে অন্য জায়গায় মজে বসে আছে।'

শঙ্কর : 'তাই নাকি ? কোথায়, কে সে ?'

ময়না আঙুল দিয়ে শঙ্করকে জানালার পাশের জায়গা দেখিয়ে বলে, 'ওখানে বস, বলছি।'

শঙ্কর জানালার পাশে বসে। এই প্রথম সে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়।

ময়না : 'তাহলে গোড়া থেকেই বলি। কী বল ? আমি আমার বারো তেরো বছর বয়সেই বাবা মাকে খেয়ে বসেছিলাম। তখন থেকে মামার বাড়িতে মানুষ···মামা লোকটা খারাপ ছিল না, কিন্তু মামী আমাকে দু'চোখে দেখতে পারত না। অপমান লাঞ্ছনা ছিল অঙ্গের ভূষণ, বুঝলে ?'

ময়না হেসে বিছানার থাকে হেলান দিয়ে বসে।

শঙ্করের চোখে তীব্র কৌতূহল।

ময়না আবার বলে, 'তবু সেই মামার বাড়িতেই আঠারো বছর বয়স অবধি মানুষ হয়েছিলাম। আর সেখানেই আমার মরণ ধরেছিল আঠারো বছর বয়সে।'

শঙ্কর : 'মরণ!'

ময়না খিল খিল করে হেসে ওঠে, থেমে বলে, 'আঠারো বছর বয়সের মেয়ের মরণ কাকে বলে জানো না?'

সূত্রধর হিসাবে আমি আপনাদের একটি নাটকীয় ঘটনার বর্তমান দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে দেখালাম। ময়না নিজের মুখে ওর যে কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল, ওর অতীত জীবন নাট্যের সেটাও একটা দিক।

আপনারা হয়তো এখন ময়না আর শঙ্করের সম্পর্কটা সম্যক বুঝে উঠতে পারেন নি। শঙ্কর নিশি পাওয়া স্বপ্নের ঘোরে বলে নি, ময়নাকে ওর চেনা লাগছে। ময়না নিজেও কি তা বুঝতে পারে নি?

তার জবাবটা ময়নার মুখ থেকে না শুনে, চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই অতীতের এক দৃশ্যপটে, সেখানেই রয়েছে ওদের পরস্পরের পরিচয়।

একটি মেয়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে ছুটে যায় বাঁধের ওপর দিয়ে। একদিকে নদী, আর একদিকে ধান ক্ষেত, বাগান, দূরে গ্রামের চিহ্ন। বাতাসে গেমো আর ক্যাওড়া আর হিজল গাছ দোলে।

মেয়েটির পিছনে ছুটতে ছুটতে একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলে ডাকে, 'সীমা! সীমা, শোন।'

সীমা নামে মেয়েটি তথাপি শোনে না। আঁচল উড়িয়ে, চুল উড়িয়ে ছুটে যায়। ছেলেটিও ছোটে। মেয়েটি হঠাৎ কিছু গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যায়।

ছেলেটি গাছপালার কাছাকাছি এসে থমকিয়ে দাঁড়ায়, আশে পাশে তাকিয়ে দেখে। প্রজাপতি ওড়ে। গাছে পাখি ডাকে।

ছেলেটি হঠাৎ মেয়েটির রঙীন শাড়ির আঁচল আর পিছন দিকটা একটা গাছের পাশে দেখতে পায়। মুখ টিপে হাসে, সরে যায়।

সীমা গাছের আড়াল থেকে ছেলেটিকে দেখবার চেষ্টা করে। দেখতে পায় না।

ছেলেটি পা টিপে টিপে সীমার পিছন দিকে এগিয়ে যায়।

সীমা গাছের আড়াল থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভুরু কুঁচকে ওঠে তার।

ছেলেটি মেয়েটির একেবারে পিছনে এসে দাঁড়ায়।

সীমা আরো ঝুঁকে পড়ে, দূরের দিকে তাকায়। অবাক হতাশায় গাছের কাছ থেকে পা বাড়াতে উদ্যত হয়। হঠাৎ ছেলেটি দু'হাত দিয়ে সীমাকে টেনে ধরে।

সীমা চমকে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ও মাগো!'

এবার ভালো করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন মেয়েটিকে। চিনতে ভুল হচ্ছে কি? সময়ের ব্যবধানে, বয়সের কিছু হেরফের। চেহারায় কিছু ভিন্নতা। আসলে যে ময়নাকে কালীচরণের বিশাল নৌকার ভিতরে দেখে এলেন, সে-ই সীমা। শঙ্করকেও না চেনার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরিচয় না দেওয়ার এই রহস্যটা কি? সীমা ময়না হয়ে এলোই বা কি ভাবে?

জবাব পাবেন। এই দৃশ্য দেখুন—অতীতের এই দৃশ্য, আর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আপনাকে আমি নিয়ে যাব শেষ রহস্যের কিনারায়। যেখানে জীবন মায়াময় প্রপঞ্চক বলে প্রমাণিত হবে।

শঙ্কর হাহা করে হেসে ওঠে। সীমার ভয় কাটতেই লজ্জা। শঙ্করের বুকের কাছে মুখ চেপে ধরে, আবার তারই বুকে গুপগুপ করে ঘুষিয়ে দেয়।

সীমাঃ 'উহ্, কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। কেন ভয় পাইয়ে দিলে?'

শঙ্কর : 'তুমি কেন আমাকে ও-কথা বলে পালিয়ে এলে ?'

সীমা : 'বেশ করেছি, আবার বলব।'

শঙ্কর : 'তাহলে আমিও এ রকম ভয় দেখাব।'

সীমা : 'আ হা হা, ভয় দেখাব।' জিভ ভেংচে দেয়।

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ মুখটা নামিয়ে নিয়ে আসে।

সীমা লজ্জা পেয়ে মুখটা ফিরিয়ে নেয় : 'এই !'

শঙ্কর গভীর করে সীমাকে বুকের কাছে টেনে নেয়।

শঙ্কর : 'সীমা, ঠাট্টা করেও অমন কথা তুমি আমাকে আর কখনো বোলো না।'

সীমা : 'আমি না হয় এখন তোমাকে ঠাট্টা করে বলেছি। কিন্তু মাসী আমার কবর খুঁড়ছে। তার ভাই ধান্নুকে রোজ আমার পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছে।'

শঙ্কর : 'কিন্তু সীমা, তোমার মামীর ভাই ওই ধান্নুর মতো নোংরা লম্পটের সঙ্গে কিছুতেই তোমার বিয়ে হতে পারে না।'

সীমা : 'বা রে, আমিই কি তা চাই নাকি ? মামী সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছে, আর কি করে ধান্নুর সঙ্গে বিয়ে দেবে, তার ষড়যন্ত্র করছে।'

শঙ্কর : 'তোমার মামা কি কিছুই করতে পারে না ?'

সীমা : 'মামা ছাই করবে। মামীর ভয়ে মামা বাড়িতে মুখই খোলে না। মামা হল ভালো মানুষ, শান্তিপ্রিয়।'

শঙ্কর : 'আমার বউ যদি ও রকম করত না, তাহলে—।'

সীমা : 'তাহলে ?'

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে।

শঙ্কর : 'আমার বউ ও রকম খাণ্ডার আর র‍্যাজাটে মোটেই নয়।'

সীমা : 'ও বাবা ! তোমার বউ হয়ে গেছে নাকি ?'

শঙ্কর : 'হয় নি, হব-হব হয়েছে তো ?'

সীমা শঙ্করের বুকের কাছ থেকে খানিকটা ছিটকে সরে যায়, চোখে মুখে বিস্ময়, 'বিয়ের আবার হব-হবটা কি ?'

শঙ্কর : 'হব-হব মানে —মানে, এই হলেই হয় আর কি।'

সীমা : 'তার মানে ?'

শঙ্কর : 'তার মানে শীগগিরই হবে।'

সীমা : 'মেয়েটি কে ?'

শঙ্কর : 'মেয়েটি ?'

সীমা ঘাড় ঝাঁকাবার অবকাশেই শঙ্কর তার দিকে হাত বাড়ায়। বলে, 'এই যে সেই মেয়েটি।'

সীমা প্রস্তুত ছিল, ছিটকে দৌড় দিল, খিল খিল করে হাসল। শঙ্করও পিছু নিল।

শঙ্কর : 'সীমা, শুনে যাও।'

সীমা (দৌড়তে দৌড়তে : 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে আজ নয়।'

শঙ্করও দৌড়ায় : 'কাল কখন আসবে ?'

সীমা : 'বিকেলে, এখানে……' সে দৌড়ায়।

শঙ্কর থেমে যায়, স্থির। দু'হাত সামনে বাড়ানো—মাথার চুল উড়ছে।

সীমা বাড়িতে ঢোকে। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে, চোখে মুখে ভয় ত্রস্ততা। টিনের চালা তিনখানা মেটে ঘরের বাড়িটা আপাত দৃষ্টিতে নিঝুম জনশূন্য।

উঠোনের এক পাশে একটি কাঁঠাল গাছ। তার নীচে একটি মাদুলী গলায়, খালি গা, দশ এগারো বছরের ছেলে, চোখে কাজল, খুরপো দিয়ে গর্ত করছিল, তার পাশে আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। মেয়েটি মাটির ভাঁড় থেকে গর্তে জল ঢালছে। আর একটি ছেলে সকলের ছোট, একটা কাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

সীমা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল। সব ঘরের দরজাই খোলা। ও পা টিপে টিপে ঘরের দিকে এগোল।

কাঁঠাল গাছের নীচে, বছর আটেকের মেয়েটি প্রথম সীমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'সীমাদি, তুমি কোথায় গেছলে? পাড়ায় পাড়ায় তোমাকে কত খুঁজে এলাম।'

সীমা: 'আমি তো রেখাদের বাড়ি গেছলাম।'

সহসা ভেতর থেকে রুক্ষ নারী কণ্ঠ ভেসে এলো: 'থা-থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না। তা ঠাটেশ্বরীর কোথায় ঠাট করতে যাওয়া হয়েছিল, শুনি?'

বালিকা: 'সীমাদি মিছে কথা বলছে মা। আমি রেখাদিদের বাড়ি গেলাম। রেখাদির মা বললে সীমাদি ও বাড়ি যায় নি।'

সীমা (ঢোক গিলে): 'রেখার মা জানবে কি করে? আমি আর রেখা তো ওদের পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে ছিলাম।'

মামীমা দাওয়া থেকে মারমুখো ভঙ্গিতে নেমে আসে: 'চুপ! আমার মেয়ে মিছে কথা বলছে?'

বালক: 'সন্ধ্যে হয়ে এলো, সীমাদির পাত্তাই নেই। আমাদের হাত পা ধুইয়ে দেবে কে? আমরা পড়তে বসব না?'

মামী: 'হাত মুখ ধুইয়ে দেবে না, ছাই করবে। সকাল থেকে গিলছে, আর আড্ডা মেরে বেড়ানো হচ্ছে!'

ঘরের দরজায় একজন পুরুষ আবির্ভাব হয়, নিরীহ গোবেচারা, সীমার মামা। বলল, 'আড্ডা মারল কোথায়? সারাদিন তো রান্নাবান্নাই করেছে।'

মামী: 'থাক, তোমাকে আর ভাগনির জন্য মুখ সাপুটি করতে হবে না। ভাগ্নির জন্যে যদি তোমার এতই প্রেম, তাহলে তাকে পটের বিবি সাজিয়ে রাখলেই তো পারো। তবে এখানে না, অন্যত্তর যেতে হবে।'

মামা: 'কী যে বল, তোমার মুখে কোন কথাই আটকায় না। আমি বলছিলাম, গেলাকোটা ছাড়াও রান্নাবান্না তো সীমাই করে।'

(কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন): 'যা সীমা যা, কী কাজকর্ম আছে ছাখ, আগে সন্ধ্যেটা দেখা, বাতি জ্বাল।'

মামী: 'না, তার আগে চা করে নিয়ে আয়। সেই কখন থেকে ধানু এসে বসে আছে। সন্ধ্যে দেখানো, শাঁখ বাজানো পরে করলেও চলবে।'

কাঁঠাল গাছতলায় বালক: 'আর আমাদের হাত পা ধোয়ানো কে করবে?'

মামী: 'সব কিছু ফেলে আগে চা করতে হবে। তারপরে হাত পা ধোয়ানো, তারপরে সন্ধ্যে দেখানো, হ্যারিকেনের চিমনি পোষ্কার করা, বাতি জ্বালানো।' (সহসা কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন): 'দেখছ, মুখপুড়ি বিকেলে চুল পর্যন্ত বাঁধে নি। মরুক গে, চুল-টুল বাঁধতে হবে না; রান্না বসাতে দেরি হয়ে যাবে।'

ঘরের ভিতর দরজার ভিতর থেকে ধনঞ্জয়—ধানু বেরিয়ে এলো। মামা তখন বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছে।

ধানু: 'বুঝলে দিদি, এই যে রোজ বিকেলের ঝোঁকে বাইরে বেরোনো, এর মধ্যে নিশ্চয় কোন বৃন্দাবন লীলা-টীলার ব্যাপার আছে। এই তোমাকে বলে রাখছি।'

সীমা দাওয়ার অন্য দিকে এগিয়ে যায়।

মামী: 'সে কি আর বুঝি না, নইলে এত বেরোবার নেশা কিসের? মাঝে মাঝে দেখি আবার দুপুরেও বেরোয়।'

ধানু: 'আমিও তক্কে তক্কে আছি, দেখো, একদিন আমি ঠিক ধরে ফেলব!'

মামী: 'আমি আপদ বিদেয় করতেই চাই।'

ধানু (জিভ কেটে): 'আপদ বিদেয় কি গো দিদি! বল আমার সঙ্গে ইয়ে দেবে—।'

মামী: 'ওই হল আর কি।'

সীমা ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাইবোনের মধ্যে চোখাচোখি হয়।

* * *

সীমা রান্নাঘরে, ছোট কাঠের উনোন থেকে, কাপড়ের আঁচল দিয়ে ধরে ধূমায়িত এলুমিনিয়ামের জলের বাটি নামায়।

দরজায় ধানু এসে দাঁড়ায়, সীমা দেখতে পায় না। ধানুর চোখে মুখে লুব্ধ লাম্পট্যের হাসি।

সীমা কৌটো থেকে চা আর চিনি নিয়ে বাটিতে ফেলে দেয়।

ধানু ঘরের মধ্যে ঢুকে, পা টিপে টিপে একেবারে সীমার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। সীমা ধূমায়িত বাটিতে একটা ঢাকনা চাপাতে উদ্যত হয়। ধানুর সেদিকে খেয়ালই নেই, সে নিচু হয়ে সীমার দু'চোখ টিপে ধরে, সেই সঙ্গে দুটি গালও।

সীমা চমকে ওঠে, মুখ বিকৃত করে। ঢাকনা চাপা দিতে গিয়ে, অস্ফুট শব্দে, গোটা গরম চা সহ বাটিটাই ছিটকে যায়, আর গরম চা ধানুর পায়ে পড়ে। তার মধ্যেই সীমার গলায়, 'কে ?' শোনা যায়।

সীমা উঠে দাঁড়ায়, বিস্ফারিত চোখ।

ধানু চিৎকার করে ওঠে, 'মরে গেলুম গো দিদি, পুড়িয়ে মারলে গো আমাকে!'

মামী দৌড়ে আসে: 'কি হল? কে পোড়ালে?'

ধানুর কাতর আর্তনাদ, আঙুল দিয়ে সীমাকে দেখায়, 'একটুস্ ভালোবেসে চোখ টিপে ধরতে গেছলুম, অমনি গরম চা আমার পায়ে ঢেলে দিয়েছে। উ হু হু হু, জ্বলে যাচ্ছে গো—।'

সীমা: 'গরম চা ঢেলে দেব কেন, পড়ে গেছে।'

মামীমা ঝটিতি এগিয়ে এসে সীমার গালে থাপ্পড় মারে: 'চুপ! পুড়িয়ে মারতে গিয়ে আবার মিছে কথা হচ্ছে? আমার ভাই মিছে কথা বলছে? মুখপুড়ি, শতেকখোয়ারি, বাপ মা খাগী।'

দরজায় মামীমার তিন ছেলেমেয়ে। সমবেত স্বরে, হেসে হেসে: 'বেশ হয়েছে! বুড়ি মেয়ে মার খেয়েছে, বেশ হয়েছে।'

মামীমা আদিখ্যেতার ভঙ্গিতে ধানুকে হাত দিয়ে তুলে ধরে দাঁড় করায়: 'আয় ভাই ধানু, ঘরে চল্, পোড়ার ঘায়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি।'

ধানু খোঁড়াবার ভঙ্গিতে মামীকে অনুসরণ করে। দরজার কাছে ধানু দাঁড়ায়, সীমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকায়। বলে, 'চলো, একবার তোমাকে ঘরে নিয়ে তুলি, তারপর বুঝিয়ে দেব, কত ধানে কত চাল হয়।'

মামী (সীমাকে) : 'নে, আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, তাড়াতাড়ি আবার চা করে নিয়ে আয়।'

দুজনে বেরিয়ে যায়। সীমার ভাবলেশহীন মুখ, শূন্য

সীমার ভাবলেশহীন শক্ত মুখ, দৃষ্টি দূরের আকাশে। গাছপালার নিবিড় ছায়ায় বসে আছে। সীমার পাশে শঙ্করের ক্রুদ্ধ চোখ মুখ। দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। শঙ্করের পাশে ঘাসের ওপর কিছু বই খাতা পড়ে আছে।

শঙ্কর : 'তুমি শয়তান ধানুটার মুখে জ্বলন্ত কাঠ গুঁজে দিতে পারলে না?'

সীমা : 'দেব, তবে ধানুর মুখে না, এবার নিজেকেই আমি কাঠ দিয়ে পোড়াব।'

শঙ্কর সীমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপে, কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করে : 'সীমা!'

সীমা শক্ত হয়ে থাকে।

শঙ্কর মুখ এগিয়ে নিয়ে আসে, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ সীমা?'

সীমার দীর্ঘশ্বাস : 'এ সংসারে আমার কি আর কারোর ওপর রাগ করা সাজে? আমি মামা মামীর গলগ্রহ, আমার মা নেই বাপ নেই—।'

শঙ্কর : 'আমি আছি সীমা। তোমার জন্য আমি কি নেই?'

সীমা তাকায় শঙ্করের চোখের দিকে। শঙ্করও। কয়েক মুহূর্ত কাটে। সীমা চোখ নামিয়ে নেয়।

শঙ্কর আবেগের স্বরে ডাকে: 'সীমা!'

সীমা জবাব না দিয়ে, ঘাসের ওপর রাখা বইয়ের পাতা ওলটায়।

বইয়ের মলাটের পরের পাতায় লেখা, 'শ্রীশঙ্কর লাল সরকার, থার্ড ইয়ার—নবহাট কলেজ—দিলদারপুর!'

শঙ্কর বইয়ের মলাট বন্ধ করে দেয়: 'সীমা, কথা বল।'

সীমা শঙ্করের দিকে একবার দেখে, তারপর অন্য দিকে তাকায়: 'কি বলব বল? তুমি দিলদারপুর থেকে নবহাটের কলেজে পড়তে যাও, মাঝখানে এই সিরাজনগরে যাতায়াতের পথে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।'

শঙ্কর: 'আমি এই সিরাজনগরের ইস্কুল থেকেই হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছি। আমার সঙ্গে তোমার ভাব তখন থেকেই।'

সীমা: 'তুমি থাক দিলদারপুরে, আর আমি থাকি সিরাজনগরে। কবে তোমার কলেজের পড়া শেষ হবে, কবে তুমি তোমার বাবাকে বলবে—।'

শঙ্কর সীমার একটি হাত চেপে ধরে: 'তুমি তো জানো সীমা, নানা গোলমালে কলেজের দুটো বছর কি ভাবে নষ্ট হয়েছে। তা নইলে তো কবেই পাশ করে বেরিয়ে আসতাম। আর বাবাকে বলা?' শঙ্কর চুপ করে যায়।

সীমা শঙ্করের দিকে তাকায়, চোখে জিজ্ঞাসা।

শঙ্কর: 'আমার বাবা যে প্রকৃতির লোক, হয়তো তোমাকে বিয়ের অনুমতি কোন দিনই দেবে না।'

সীমা: 'কেন, তোমার বাবা কি খুব সেকেলে?'

শঙ্কর: 'সেকেলে একেলে বলে বাবার কিছু নেই, সে এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ—তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না সীমা, তাই ওদিকটা আমি ভাবছিই না।'

সীমা ঃ 'ভাবছ না মানে? বাবাকে বলবে না?'

শঙ্কর ঃ 'না, বলব না। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ না করলে, চাকরির বাজারে কি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব?...তবে এখন ভাবছি—।' কথা শেষ করে না।

সীমার কৌতূহল ঃ 'কি ভাবছ?'

শঙ্কর ঃ 'কি হবে বি. এ পাশ করে? দরকার নেই, বরং তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ের রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলি—তারপরে—।'

সীমা ঃ 'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।' (হেসে ফেলল)

শঙ্কর ঃ 'কেন, বাসা ভাড়া করব।'

সীমা ঃ 'টাকা?'

শঙ্কর ঃ 'বাবার বাক্সো থেকে কিছু হাতিয়ে নিয়ে যাব।'

সীমার ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখের তারায় ঝিলিক ঃ 'তারপরে যখন সেই টাকা ফুরিয়ে যাবে, আর চাকরিও তার মধ্যে না পাও?'

শঙ্কর (অপ্রস্তুত, আমতা আমতা করে) ঃ 'চাকরি না পেলে? অ্যাঁ? চাকরি না পেলে—।'

সীমা ঃ 'হরিমটর চিবাবো দুজনে।'

শঙ্কর অবাক চোখে সীমার দিকে তাকায়। সীমা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

শঙ্কর (গম্ভীর হয়ে) ঃ 'আমি এত সীরিয়াসলি ভাবছি, আর তুমি ঠাট্টা করছ?'

সীমা ঃ 'মোটেই ঠাট্টা করছি না মশাই। আর তো দু-এক মাস, পরীক্ষাটা তোমাকে দিতেই হবে।'

শঙ্কর ঃ 'কিন্তু তোমার এ রকম লাঞ্ছনা যে আমার আর একটা দিনও সহ্য হচ্ছে না।'

সীমা ঃ 'তোমার মুখ চেয়ে আমি সবই সহ্য করতে পারি, তুমিও তাই করবে।'

শঙ্করের চোখে মুখে গভীর আবেগ নেমে আসে। সীমার কোলের ওপর একটি হাত রাখে।

সীমা : 'তুমি আছ, এই ভেবেই আমি শক্তি পাই।'

শঙ্করের হাত উঠে আসে সীমার গালে। সীমার চোখে মুখেও আবেগ ফোটে। শঙ্করের মুখ নেমে আসে।

সীমা ঝুপ করে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। শঙ্কর হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়।

সীমা ঘাস এবং ঘাস ফুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আরো সরে যায়।

যেন ওদের খেলা দেখেই পাখি ডাকে, প্রজাপতি ওড়ে।

শঙ্কর উপুড় হয়ে হামা দিয়ে সীমাকে ধরতে যায়।

সীমা আরো গড়িয়ে, হঠাৎ একটা ঢালুর কাছে গিয়ে, নিজেকে আর সামলাতে পারে না ; আর্তনাদ করে, নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

শঙ্কর ঢালুতে ঝাঁপ দেয়। তুজনে জড়াজড়ি করে একটা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে।

জলে ঢেউ লাগে, শাপলা ফুল পাতা দোলে, ফড়িং ওড়ে।

সীমা জলের ধারে উঠে বসে : 'এ মা! কি হবে? কাপড় ভিজল কি করে, মামীকে কি বলব?'

শঙ্করও পাশে বসে : 'যেমন আমার কাছে ধরা দিলে না।'

সীমা শঙ্করের বুকে খোঁচা দিয়ে বলে, 'তুমি ধরতে এলে বলেই তো পড়ে গেলাম।'

শঙ্কর সীমাকে টেনে কাছে নেয় : 'পালাতে গেলে কেন? আর পালাবে কোন দিন?'

সীমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে আসে।

আমি ভ্রমর, উড়ে উড়ে দেখছি আর একটা ঘটনা।

গাছের আড়ালের ঠিক ওপরের ঢিবির ওপরেই ধানু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে তার সন্দেহ। গাছের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দেয়।

হঠাৎ ওপর দিকে একটা শব্দ হয়। সীমা চমকে শঙ্করের মুখের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে, ঢিবির দিকে তাকিয়ে ধান্নুকে দেখতে পায়। (ফিস ফিস স্বর): 'ধান্নু ঢিবির ওপরে।' বলেই জলের ধার দিয়ে মাথা নীচু করে পালাতে পালাতে বলে: 'সন্ধ্যেবেলা, বাঁধের ধারে এসো।'

ধান্নু তখন সন্দিগ্ধ চোখে নিচের গাছপালাগুলোর দিকে দেখছে। তারপরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

সীমা অনেক দূরে, গাছের আড়াল থেকে হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়।

ধান্নু আস্তে আস্তে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে আসে।

শঙ্কর মাতালের ভঙ্গিতে ঢালুতে শুয়ে পড়ে, গুন গুন গান গায়।

ধান্নু কাছে এসে দাঁড়ায়: 'কে হে ছোকরা তুমি, এখানে কি করছ?'

শঙ্কর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'তুমি কে বাবা নটবর, আমার নিরিবিলির মৌতাতটি নষ্ট করতে এলে?'

ধান্নু: 'ব্যাটা মাতাল একলা একলা কথা বলছিল, আর আমি ভাবলাম অন্য কেউ আছে।'

শঙ্কর: 'তুমিই তো আছ বাবা, একটা বোতল নিয়ে এসো না।'

ধান্নুর মুখ হতাশায় বিকৃত: 'ধুত!' সে ফিরে যায়।

শঙ্কর চোখের কোলে তাকায়। ঠোঁটের কোণে হাসি।

একটা টুনটুনি পাখি পিক্ পিক্ করে ডেকে ওঠে।

সীমার জীবনযাপনের প্রাত্যহিক ছবিটা এই রকম: দৃশ্যের পর দৃশ্যে ভেসে ওঠে: সীমা উনোনের ধারে রান্না করছে। সীমা ঘর দরজা লেপছে। সীমা কাপড় কাচছে। সীমা বাসন মাজছে।

ঘরের মধ্যে মামী মনোহরা আর ধান্নু। চোখে মুখে ষড়যন্ত্রের ছাপ। নীচু স্বরে কথা বলছে।

ধান্নু : 'বুঝলে দিদি, ছুঁড়িকে জোর করে তুলে না নিয়ে গেলে হবে না।'

মনো : 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু বাড়ি থেকে কি করে তুলে নিয়ে যাবি ?'

ধান্নু : 'বাড়ি থেকে তুলব কেন ? বাইরে যখন যাবে, তখনই এক ফাঁকে, ঝোপ বুঝে কোপ। একেবারে মহাদেবের মতো সতীকে কাঁধে ফেলে ছুট।'

মনো : 'দিনের বেলা ? লোকে দেখবে যে ?'

ধান্নু : 'দিনের বেলা কেন ? সন্ধ্যের ঝোঁকে। সীমা তো এক একদিন সন্ধ্যের দিকে ফেরে। আমি ঠিক তক্‌কে তক্‌কে থেকে ওকে ধরে ফেলব।'

মনো : 'অবিশ্যি রাত্তিরবেলা যখন ও ঘরের বাইরে যাবে, তখনও—।'

ধান্নু : 'ওরে বাবা, তোমার কর্তাটি জেগে গেলেই।'

মনো (হেসে) : 'আরে ও কিছু করতে পারবে না।'

ধান্নু : 'না বাবা, জামাইবাবু চুপচাপ থাকে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব রাগ। ও লোক মোটেই সুবিধার না। তুমি বরং সীমাকে একটু লাই-টাই দাও, বেশি করে বাইরে যেতে দাও, মিষ্টি মিষ্টি কথা-টথা বল।'

মনো ঘাড় ঝাঁকায়। চোখে ইশারা করে। দুজনে হাসে।

সন্ধ্যায় নদীর বাঁধের নিরালায়। এখনও পাখিরা উড়ে যায়। নদীর বুকে কালো পাল তোলা নৌকা। একটি হিজল গাছের নিচে শঙ্কর আর সীমা বসে আছে।

সীমা : 'মামীর হাবভাব আমার মোটেই ভালো লাগছে না। সেই সঙ্গে ধান্নুরও।'

শঙ্কর : 'কেন, তুমি তো সেদিন বললে, মামী তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে। ধান্নু কাছে ঘেঁসছে না।'

সীমা : 'সেটাই তো ভয়ের। জানো না, সুন্দরবনের বাঘ যাকে খাবে, তাকে যখন দূর থেকে চারপাশে চক্কর দেয়, তখন কিছুই বোঝা যায় না। তারপর চক্করটা ছোট করে আনতে আনতে, এক লাফে ঘাড়ে ঝাঁপ দেয়।'

একটু দূরেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ধান্নুকে বাঁধের একপাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে মাথা তুলে উঁকি মারতে দেখা যায়। তার চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে। আপন মনে মাথা ঝাঁকায়।

শঙ্কর : 'তোমার মাথায় আসেও বটে! কিন্তু তা না-ও তো হতে পারে।'

সীমা : 'সাধে কি আর আসে? আমি যে ঘরপোড়া গরু। মামীকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন, তুমিই বল না।'

শঙ্কর : 'হয়তো এতকাল দেখে বুঝেছে, তোমাকে কায়দা করা যাবে না। তাই আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

সীমা অবিশ্বাসে মাথা নাড়ে।

ধান্নু একটা জানোয়ারের মতোই বুকে হেঁটে এগিয়ে আসতে থাকে।

সীমা : 'আমি তোমার মতো এত সহজে সব মেনে নিতে পারি না। ধান্নুর দূরে দূরে থাকা, আমাকে আরও ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।'

ধান্নু বুকে হেঁটে প্রায় সীমা শঙ্করের কাছাকাছি।

শঙ্কর (হেসে) : 'তার মানে সুন্দরবনের বাঘ!'

ধান্নু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়; চিবিয়ে ঝাঁজিয়ে বলে : 'হ্যাঁ, সুন্দরবনের বাঘ!' (বিকৃত হাসি) : 'আর তুমি সুন্দরী এতকাল বাদে ধরা পড়েছ। এখানেই তাহলে পীরিতের খোয়ারি ভাঙতে আসা হয়?'

শঙ্কর, সীমা দুজনেই ঝটিতি উঠে দাঁড়ায়।

ধান্নু শঙ্করকে বলে, 'আর তুমি শালা সেদিন মাতাল সেজে আমাকে খুব র‍্যালা দিয়েছিলে।'

শঙ্কর: 'ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন।'

ধান্নু: 'চোপ্‌ শালা, ও সব ভদ্রতা অন্য জায়গায় দেখাবে।' বলেই খপ করে সীমার হাত ধরে, এক হ্যাঁচকায় নিজের গায়ের ওপর টেনে নেয়: 'এবার চল তো সুন্দরী! তোমার পীরিতের খোয়ারি আমিই ভাঙব।'

সীমা আর্তনাদ করে, ধান্নুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

শঙ্কর ধান্নুর পথরোধ করে রুখে দাঁড়ায়: 'কোথায় নিয়ে যাবে তুমি ওকে?'

ধান্নু: 'জাহান্নামে। খবরদার, আমার পেছুতে লাগতে এসো না। আমি গোখরো সাপ, আর এ আমার মাথার মণি!'

সীমা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে: 'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি, অসভ্য, নোংরা ইতর।'

ধান্নু সীমাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, হা হা করে হাসে।

শঙ্কর সীমাকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায়, ধান্নুর এক হাত টেনে মুচড়ে ধরে।

ধান্নু ঝটিতি হাত ছাড়িয়ে শঙ্করের গালে ঘুষি মারে।

শঙ্করও একসঙ্গে পালটা ঘুষি আর লাথি চালায়।

সীমা ধান্নুর হাত ছাড়া হয়ে, একপাশে সরে যায়।

ধান্নু: 'তবে রে শালা! তুই আমার সঙ্গে লড়তে এসেছিস?' সে কোমর থেকে চকিতে একটা ধারালো ছুরি বের করে।

সীমা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে; এবং ধান্নুর হাত ধরতে যায়।

ধান্নু শঙ্করের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছুরি তোলে।

শঙ্কর ক্ষিপ্রতায় ধান্নুর হাতটা ধরে ফেলে। অন্ধকার কিছুটা গাঢ়তর হয়ে আসে।

সীমা দুজনের ছুরি কেড়ে নেবার চেষ্টা এবং ঝটাপটি লড়াই, অসহায় ভয়ার্ত চোখে দেখতে থাকে। কাছে গিয়েও সুবিধে করতে পারে না।

শঙ্কর আর ধানু দুজনেই, জাপটা জাপটি অবস্থায় নদীর ঢালুতে গড়িয়ে পড়ে।

সীমা স্পষ্ট কিছুই দেখতে পায় না। কেবল অস্পষ্ট দুটি ছায়া ছায়া মূর্তির জলের ধারে কাদায় জাপটা জাপটি লড়াই, আর মাঝে মাঝে ছুরির ঝিলিক।

সীমা : 'শঙ্কর!'

হঠাৎ শঙ্করের আর্তনাদ ভেসে আসে, 'আ—আ—আ— !'

সীমার আর্তনাদ : 'খু—ন! খু—ন!'···

পরমুহূর্তে জলে ঝপাং করে কারোর পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়। সীমা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে—ওর ঠোঁটের অভিব্যক্তি, 'খু—ন!' কিন্তু নিঃশব্দ এবং শক্ত।

এবার ফিরে আসুন আবার নৌকায়। সীমার—থুড়ি, ময়নার কথাগুলো দৃশ্যান্তরের মধ্য দিয়ে দেখলেন। আবার ফিরে আসা যাক বর্তমানে, যেখানে নৌকার ভিতরের ঘরে, জানালার ধারে শঙ্কর আবেগ ব্যাকুল, তীব্র কৌতূহলিত মুখে তাকিয়ে আছে ময়নার দিকে।

সীমার চোখে যেন সেই অতীতের ঘটনার ভয়ের অভিব্যক্তি।

শঙ্কর : 'তারপর?'

সীমা (চমকে): 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, আমি তো ভেবেছিলাম, ধানু তোমাকে মেরে ফেলেছে। ধানুর হাতে ধরা পড়বার ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম।'

শঙ্কর : 'সেদিন জলে ঝাপিয়ে সাঁতার কেটে সরে না গেলে, হয়তো শেষ পর্যন্ত মরতেই হত। কিন্তু তুমি তারপরে কোথায় চলে গেলে ?'

সীমা : 'সে কথা এখন নয়, পরে।'

শঙ্কর : 'তাহলে আমি তোমাকে ঠিকই চিনেছিলাম।'

সীমা : 'আমিও চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি বেঁচে আছ, বিশ্বাস করতে পারি নি।'

শঙ্কর : 'সীমা—'

সীমা : 'না সীমা নয়, ময়না।'

শঙ্কর (স্বরে আবেগ) : 'তাহলে তোমার সঙ্গে আমার পুরনো জীবনের জোড়া কি আর লাগবে না ?'

সীমা : 'আগে মণিমহেশপুরে যাই, তারপরে।'

শঙ্কর : 'সেখানে কে আছে ?'

সীমা : 'ছিল, এখন কেউ নেই। সেখানে এখনো আমার বাবা মায়ের স্মৃতি পড়ে আছে। তোমাদের নৌকোয় আমি মণিমহেশপুর নেমে যাব।'

শঙ্কর : 'আমিও তোমার সঙ্গে মণিমহেশপুরে নেমে যাব।'

সীমা : 'তা যেও, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার চেনা জানার কথা যেন তার আগে জানাজানি না হয়।'

দরজার ওপর শম্ভুর মুখ দেখা যায় : 'বাহ্। কি রান্না রাঁধছিস রে দাদা ?'

সীমা চমকে উঠে খানিকটা সরে যায়।

শম্ভু : 'প্রেমের চচ্চড়ি বানাচ্ছিস বুঝি ?'

শঙ্কর : 'যা খুশি তাই করছি, তুই যা এখান থেকে।'

শম্ভু সরে যায়

সীমা : 'তোমার বাপ ভাইকে কখনো দেখি নি, চিনতাম না। তোমার ছোট ভাইকে দেখে ধানুর কথা মনে পড়ে যায়।'

শঙ্কর : 'ভয় নেই, আমি আছি।'

নৌকার ঘরের বাইরে, নীচের পাটাতনে শম্ভু হেঁকে বলে, 'বাবা, দ্যাখোগে তোমার বড় ছেলে কি রকম রান্না করছে।'

হালের কাছে আসীন কালীচরণ জিজ্ঞেস করে, 'কেন, কি করছে?'

নীচের পাটাতনে শম্ভু : 'ছুঁড়িটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে খুব মাখামাখি হচ্ছে।'

হালের আসন থেকে কালীচরণ উঠে দাঁড়ায়। নীচে নেমে এসে দাঁড়ায় ঘরের দরজায়। ঘরের ভিতরে তখন শঙ্কর উনোনের উপর কড়ায় খুন্তি নাড়ছে। হাবা হাসছে। সীমা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে।

কালীচরণ বিড়বিড় করে বলে, 'শম্ভেটা মিথ্যুক।'

বিশাল নৌকাটি নদীর বুকে নোঙর করা। পাশের কাছির সঙ্গে বাঁধা বাছাড়ি ছোট নৌকার মাঝিরা নিজেদের রান্না করছে।

বড় নৌকায় ঘরের ভিতরে কালীচরণ, শঙ্কর, শম্ভু খেতে বসেছে। হাবা পরিবেশন করতে যাচ্ছিল, সীমা তার হাত থেকে হাতা নিয়ে নিজেই পরিবেশনে লাগে।

কালী : 'বাহ্‌, বাহ্‌, বাহ্‌! এই তো খাঁটি মেয়েমানুষের মতন কাজ। তোমাকে আমার বেশ ভালোই লাগছে।'

শঙ্কর আর শম্ভুর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। কালীচরণের লুব্ধ দৃষ্টি সীমার চলন্ত শরীরকে যেন লেহন করতে থাকে। বড় বড় গরাসে সপাসপ শব্দে ভাত খায় আর আওয়াজ ছাড়ে : 'আহ্‌! বেশ বেশ! বাহ্‌!'

হাবা অঁক অঁক শব্দে সীমার গায়ে খোঁচা দিয়ে, কোন্ খাবারের পরে কি দিতে হবে, তার নির্দেশ দেয়।

শম্ভু (হাবাকে): 'এই, তুই থাম্।'

কালী: 'হ্যাঁ, তুই হারামজাদা ওর গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন?' (সীমাকে) 'এই যে, আমাকে আরও ভাত দাও তো, ভাত দাও।' (ভঙ্গি করে) 'বাহ্, বেশ বেশ!' তৃপ্ত স্বরে গলাখাকারি দেয়।

সীমার সঙ্গে শঙ্করের চোখাচোখি হয়।

কালী (সীমাকে): 'এই, এই মেয়ে, ছাখো, আমার নৌকোয় উঠেছ, আমার কথা ছাড়া চলবে না। বাইরে-টাইরে যাবে না, বুঝেছ? হা—হা—হা বেশ বেশ!'

হাবা গলায় অদ্ভুত শব্দ করে। শূন্য তরকারির পাত্র দেখিয়ে, ফুরিয়ে যাবার ইশারা করে।

শম্ভু: 'ঠিক আছে, তোরা তরকারি ছাড়াই খাবি। আমাদের তো হোক।'

শঙ্করের সঙ্গে সীমার আবার চোখাচোখি হয়। সীমার চোখে যেন একটা অস্পষ্ট ইশারা খেলে যায়। ইঙ্গিতটা—শঙ্করকে মুখ খুলতে না বলা।

কালী: 'হ্যাঁ, শোন শঙ্কর. তুই খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা পয়সা সব বুঝে নিয়ে এসেছিস তো?'

শঙ্কর: 'এসেছি।'

কালী: 'তাহলে খেয়ে নিয়ে তুই ছোট বাছাড়ি নৌকোটা নিয়ে, ওপারে কমলপুরে ইয়াসিন মিঁয়ার কাছে একবার চলে যা। মাঝিরা এখন একটু বিশ্রাম করবে, সেই ফাঁকে তুই ঘুরে আয়। ইয়াসিনকে এক হাজার টাকা দিয়ে, সই করিয়ে নিবি। বলবি, সে যেন কাল বিকেলে শিবগঞ্জের ঘাটে ছুটো লরিই নিয়ে থাকে। বুঝলি?'

শঙ্কর: 'বুঝেছি।'

কালী: 'সত্য মাঝিকে সঙ্গে নিস—টাকা পয়সা সাবধান।' (সীমার দিকে তাকিয়ে): 'আহ্, বেশ বেশ, বড় ভালো খেলাম।'

শম্ভু মুখ থেকে অদ্ভুত বিকৃত একটা শব্দ করে, যেন গলায় কিছু আটকে গিয়েছে।

কালী (চমকে) : 'কি হল ?'

সীমার সঙ্গে শঙ্করের চোখাচোখি হয়। সীমার ঠোঁটের কোণে চকিতে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

শম্ভু : 'কিছু না, বেশ, বেশ ভালোই।'

কালীচরণ ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়,—সকলের দিকেই তাকায়—কিন্তু কেউ কিছু বলে না। সীমা ধীর পায়ে একপাশে সরে যায়।

আকাশের ওপর সূর্য নীল জলে চিক চিক করে। বাছাড়ি ছোট নৌকা নেই। শঙ্কর টাকা নিয়ে সত্য মাঝির সঙ্গে কমলপুরে গিয়েছে। কয়েকজন মাঝি নীচের পাটাতনে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাদের মাঝখানে হাবাও আছে।

ওপরের দোচালা ছই মাচার ওপরে, হালের কাছে কালীচরণ নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। একটু দূরে, মাচার ওপর থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে শম্ভু সিগারেট টানছে। তার দৃষ্টি নৌকার ঘরের খোলা দরজার দিকে।

সীমা ঘরের ভিতর জানালার এক পাশে ঘুমায়। খোলা চুল, অবিন্যস্ত আঁচল।

শম্ভু কালীচরণের দিকে তাকায়। কালীচরণ নাক ডাকাচ্ছে।

শম্ভু উঠে দাঁড়ায়, তারপর পা টিপে টিপে, সিঁড়ি দিয়ে নীচের পাটাতনে নামে।

ঘুমন্ত মাঝিদের এবং হাবার দিকে তাকায়। তারপর পা টিপে টিপে ঘরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত সীমা।

শম্ভু মাথা নীচু করে সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তবু একটু শব্দ হয়ে যায়।

সীমা চোখ মেলে প্রথমে জানালার দিকে তাকায়। কিছুই দেখতে পায় না।

শম্ভু দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে, মসৃণ কাঠের মেঝেয় পা দেয়।

সীমা মুহূর্তে সচকিত হয়, ঝটিতি উঠে বসে, শম্ভুর দিকে তাকায়। চোখে ভয় চকিত দৃষ্টি, স্খলিত স্বর : 'কি চাই ?'

শম্ভুর ঠোঁটে ইতর হাসি : 'কি দিতে পারো তুমি ?' আরও এক পা এগোয়।

সীমাও পেছোতে থাকে, জানালার ধার চেপে ধরে : 'দরজা বন্ধ করলে কেন ?'

শম্ভু : 'তবে কি হাট করে খুলে রেখেই সব হবে ?'

সীমা ওর কোমরের কাছে একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়, আবার শম্ভুর দিকে।

শম্ভু আরও এক পা এগোয়।

সীমা আরও পিছোয়, এবং পিছনের হুড়কো লাগানো ছোট দরজার গায়ে ঠেকে যায়।

সীমা (কঠিন মুখে স্বর চড়িয়ে) : 'দরজা খুলে দাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।'

শম্ভু : 'চেঁচালেও আমার বাপ বুড়ো কিস্যু শুনতে পাবে না, সেই ওপরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দাদা গেছে কমলপুরে।'

সীমা : 'কি চাও তুমি আমার কাছে ? আমাকে চাও ?'

শম্ভু : 'বুঝতে পারছ না ?'

সীমা : 'বেশ তো, তাই নিও। কিন্তু তুমি কি আমার দায়িত্ব নিতে পারবে ?'

শম্ভু (ভঙ্গি বদলিয়ে, গম্ভীর ভাবে): 'দায়িত্ব? তার মানে বিয়ে?'

সীমা: 'হ্যাঁ, তাছাড়া আমি আর তোমাকে সব কিছু কেমন করে দিতে পারি?'

শম্ভু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, শেষে বিশ্বাস করে বলে, 'তা করতে পারি।'

সীমা: 'কিন্তু তোমার বাবা?'

শম্ভু: 'বাবা কি করবে, ও সব বাবা-টাবার কোন পরোয়া আমি করি না।'

সীমা: 'বেশ, আমাকে যখন বিয়ে করতেই চাও, তখন আমার কথা তোমার কিছু শোনা উচিত। তা নইলে ভাববে তোমাকে আমি ইচ্ছে করে বিপদে ফেলেছি।'

শম্ভু: 'বিপদ?'

সীমা: 'হ্যাঁ, সব শুনলে বুঝতে পারবে, আমার পিছু পিছু বিপদ ঘুরছে।'

শম্ভু: 'বেশ, বল।'

সীমা: 'তাহলে দরজাটা খুলে দাও, খুলে আমার সামনে বস, আমি বলছি।'

শম্ভু এক মুহূর্তের জন্য সন্দিগ্ধ, তারপরে দরজা খুলে দিয়ে এগিয়ে আসে, পা ছড়িয়ে বসে: 'বল, তোমার কি কথা আছে।'

সীমাও আস্তে আস্তে পিছনের বন্ধ দরজা ও কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে।

সীমা: 'জানো, অল্পবয়সেই আমার বাবা মা মারা যায়, আমি মামা-মামীর গলগ্রহ হয়েছিলাম। এখন থেকে দু' বছর আগে, মামীর এক ভাই জোর করে আমার সর্বনাশ করতে চেষ্টা করে। মামীরও তাতে সায় ছিল। আমার মামা ছিল ভালো মানুষ।···একদিন মামীর ভাই যখন আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল, আমি রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে গেলাম···।'

এবারে চলুন, ধান্নুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে, শঙ্করের নিশ্চিত মৃত্যু আশঙ্কা করে, সীমার সেই রাত্রে পালিয়ে যাবার ঘটনাস্থলে আপনাদের নিয়ে যাই।…

ধান্নুর আক্রমণের হাত থেকে পলায়নের সেই ছবি, হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে।

সীমা দৌড়চ্ছে অন্ধকার বাঁধের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে গাছ-পালার নিবিড় অন্ধকারে ওকে দেখা যাচ্ছে না। আবার হঠাৎ ভেসে উঠছে। ছুটছে। মাঝে মাঝে আশেপাশে গৃহস্থদের দু-একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

সীমা না থেমে ছুটছে। কিন্তু অবসন্ন ক্লান্ত—আর ছুটতে পারছে না।

অস্পষ্ট একটা পাঁচিল, সীমা যার পাশ দিয়ে ছুটছে।

অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা সিংহ দরজা। দরজা খোলা।

সীমা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁপায়।

সিংহ দরজার ভিতরে ইতস্তত কয়েকটা আলো দেখা যায়। সেই আলোয় অস্পষ্ট যুঁই মালতীর কেয়ারী করা ঝোপ, অন্যান্য ফুলের গাছ, আরো ভিতরে একটি দোতলা থামওয়ালা বাড়ির আবছা অবয়ব। দেখে মনে হয় বাগানবাড়ি।

সীমার পিছন থেকে একটি বৃদ্ধ হ্যারিকেন হাতে, বাইরের দিকে এগিয়ে এসে, সীমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। সীমা চমকায়, ভয়ে পালাতে উদ্যত হয়।

বৃদ্ধ: 'কে মা তুমি?'

বৃদ্ধের কোমল স্নেহপরায়ণ কথায় সীমা দাঁড়িয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ (হ্যারিকেন তুলে): 'কে মা তুমি, এ রাতের অন্ধকারে, একলাটি এখানে। তোমাকে তো এ তল্লাটে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।'

সীমা (এখনও নিঃসন্দেহে নির্ভয় নয়): 'না, আমি এখানকার নই। তুমি কে?'

বৃদ্ধ (বাড়ি বাগান দেখিয়ে) : 'চৌকিদার বল, মালী বল, এই বাগানবাড়ির আমিই সব।'

সীমা : 'কাদের বাগানবাড়ি ?'

বৃদ্ধ (ফোকলা দাঁতে হেসে) : 'নাম বললে কি তুমি চিনতে পারবে মা ? মালিকের পরিবার মস্ত ধনী, লেখাপড়া জানা পণ্ডিত। কোলকেতায় থাকেন ?'

সীমা : 'এখানে থাকে না ?

বৃদ্ধ : 'মাঝে মধ্যে কেউ আসেন। কিন্তু তোমার কথা তো বললে না মা ? দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বহুদূর থেকে যেন ভয়ে পালিয়ে এসেছ, দাঁড়াতে পারছ না, দরদর করে ঘামছ।'

সীমা (একটু চিন্তা করে) : 'ঠিক বলেছ বাবা।'

বৃদ্ধ : 'তুমি আমাকে বাবা বললে ?

সীমা : 'হ্যাঁ, বাবা, তুমি যে সত্যি কথাই বলেছ। আমাকে বেইজ্জত করার জন্য শয়তান আমার পেছু নিয়েছে। আমাকে বাঁচাবার কেউ তো নেই, তাই আমি পালিয়েছি।'

বৃদ্ধ : 'আ, হাহা, কি অধর্মের কথা। আমার সাত কুলে কেউ নেই মা, তুমি আমার কাছে মেয়ের মতন থাকবে চল, আমি তোমাকে বাঁচাব।'

সীমা গভীর চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকায়।

বৃদ্ধ : 'কি হল মা, বুড়োকে তোমার ভয় লাগছে ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

সীমা : 'না বাবা, তা নয়। আমার কপালটাই যে পোড়া।'

বৃদ্ধ : 'ছি মা, এমন কথা কি বলতে আছে ? চল, তুমি আমার ঘরে চল, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো, তা'পরে তোমার সব কথা শুনব। এসো মা।'

বৃদ্ধ হ্যারিকেন নিয়ে চলতে থাকে। সীমা অনুসরণ করে।

দিনের বেলা, গোটা বাগান বাড়ি ও পুকুর, গাছপালা, ফুল।

সীমা ফুলগাছের চারার আশপাশ থেকে ঘাস টেনে তুলছে।

বৃদ্ধ মালী এসে দাঁড়ায়, হাসে: 'বাহ্! মা আমার বাগানের কাজও শিখে গেছে।'

সীমা (হেসে): 'বাবা, তুমি ফুলগাছের গোড়ায় সার দেওয়া দেখালে না?'

বৃদ্ধ: 'দেখাব মা, এবার তোমাকে পোকা কি দিয়ে কেমন করে মারতে হয়, তাই দেখাব, চল।'

একটি নধর চারা গাছে বড় চন্দ্রমল্লিকা ধরেছে। গাছের পাতায় ও ডালে পোকা।

বৃদ্ধ: 'এই ছাখো মা, এই সব পোকা গাছের ডাল পাতা ফুল, সব খেয়ে ফেলে, নষ্ট করে দেয়। তোমার মামীর ভাই সেই ধানুর মতো —এই সব পোকারা সব সুন্দর জিনিস খেয়ে ফ্যালে।'

গাছের গায়ে সুঁয়ো বিছানো লম্বা লম্বা পোকা দেখে, সীমার গা ঘুলিয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ একটা হাঁড়ি থেকে, মাটির ভাঁড়ে তরল ওষুধ নিয়ে গাছের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা পোকা থপ্ করে মাটিতে পড়ে যায়।

বৃদ্ধ: 'এই রকম বিষ দিয়ে এদের মেরে ফেলতে হয়, কিন্তু খুব সাবধান। এ বিষ কোন রকমে নিজের পেটে গেলে আর দেখতে হবে না।'

সীমা (হেসে): 'এ বিষ খেয়ে তাহলে মরাও যায়?'

বৃদ্ধ: 'ছি মা, ও কথা বলতে নেই। তাহলে আর তুমি মামীর ভাই ধানুর হাত থেকে পালালে কেন? মানুষকে লড়াই করেই তো বাঁচতে হয়।'

বৃদ্ধের কথায় সীমার ভাবান্তর হয়। সে আশান্বিত হয়।

* * *

সীমার জীবনটা এখন এইভাবে কাটছে :

সীমা মালীর ঘরে রান্না করছে। সীমা জুঁইয়ের কেয়ারিতে লতাগুলো তুলে তুলে সাজিয়ে দিচ্ছে। সীমা ফুলের বাগানে ফুলগাছের শুকনো পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সীমা গাছপালা পাখির ডাক ও ফুলের বাগানে খুশি মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুকুরের চারপাশে গাছপালা, বাঁধানো ঘাট! সীমা পুকুরের জলে একটি যৌবনোচ্ছল মৎস্যকন্যার মতোই আপন মনে সাঁতার কেটে স্নান করছে

সীমার চোখে পড়ে না, বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে একজোড়া চকচকে এ্যালবার্ট জুতো। তার ওপরে ফুল কোঁচানো ধুতি। তার ওপরে রেশমী পাঞ্জাবী, বোতাম ঘরে হীরার বোতামের ঝিলিক, তার ওপরে একটি যুবকের মুখ। এক জোড়া গোঁফ। চোখে মুগ্ধতা, অবাক দৃষ্টি পুকুরের জলে।

সীমা সাঁতার কেটে সিঁড়িতে এসে পা দেয়। কোন দিকে না তাকিয়ে কাপড় ঠিক করে। ওপরে উঠতে থাকে।

প্রথমে জুতো, তারপরে গোটা চেহারাটা ওর চোখে পড়ে। সীমার চোখে শঙ্কা, গলায় অস্ফুট আর্তনাদ।

যুবক : 'বাহ্! এ বাগানে এমন একটি ফুল কবে ফুটল, জানি না তো?'

সীমা ভেজা গায়ে মাথা নীচু করে দ্রুত যুবকটির পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে।

যুবক (পথরোধ করে : গম্ভীর স্বর) : 'কে তুমি? তোমাকে কখনো আমাদের বাগানে দেখি নি তো?'

সীমা (সভয়ে) : 'আজ্ঞে, আমি মালীর মেয়ে।'

যুবক (অবাক) : 'মালীর মেয়ে! তার মানে অভয় খুড়োর মেয়ে তুমি? কই, কখনো শুনি নি তো, অভয় খুড়োর সাত কুলে কেউ আছে?'

সীমা (সভয়ে বিনীত) : 'মিথ্যে বলছি না, বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

যুবক পথ থেকে সরে দাঁড়ায় : 'হুঁ! অবাক কাণ্ড তো!'

সীমা ভেজা কাপড় জড়িয়ে দ্রুত চলে যায়।

যুবক তাকিয়ে দেখে, সীমার চলার ছন্দে তার কানে যেন নূপুরের ঝনক বাজে।

বাগানবাড়ির ভিতরের বসবার ঘর। যুবক চেয়ারে বসে। সামনে অভয় মালী।

যুবক : তা খুড়ো, 'কই, কখনো শুনি নি তো, তোমার কোন মেয়ে আছে?'

অভয় ফোক্‌লা দাঁতে হাসে : 'সত্যি কি আর আমার নিজের মেয়ে বড় খোকাবাবু। আমি ওকে মেয়ের মতন দেখি, ও আমাকে বাবা বলে ডাকে।'

যুবক : 'তা বৃত্তান্তটা কি? মেয়েটা এলো কোত্থেকে?'

অভয় : 'বড় খোকাবাবু, সে এক পাপের কথা। মেয়েটার নিজের এক আত্মীয় জোর করে বেইজ্জত করার তালে ছিল. অন্ধকারে পালিয়ে চলে আসে, আমি দেখতে পেয়ে, সব শুনে আমার কাছে থাকতে দিয়েছি···অন্যায় করি নি তো বড় খোকাবাবু?'

বড়খোকা (হঠাৎ যেন সংবিত পেয়ে) : 'না না, অভয়খুড়ো, এতে আবার অন্যায়ের কি আছে? এ তো খুব ভালো কাজ করেছ তুমি,— একটা মেয়েকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। আসলে—মানে, আমি তো জানি না, হঠাৎ দেখে—।'

অভয় : 'বুঝিচি গো, বুঝিচি, খুব তাজ্জব হয়ে গেছ! হবারই তো কথা। তুমি এসেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, বলবার সময় পাই নি। তোমায় বলতাম সবই।'

বড়খোকা: 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। মেয়েটা ভালো তো?'

অভয়: 'খুব ভালো মেয়ে, বড় খোকাবাবু। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। বাগানের কাজ করে, রান্না করে, এ বাড়ির ঘর দরজা পরিষ্কার করে।'

বড়খোকা: 'বাহ্! এ তো বেশ ভালো কথা খুড়ো। তোমার বুড়ো বয়সে দেখ-ভাল করার একজন মিলে গেছে।'

অভয়: 'অই যা-ই বল, বড় খোকাবাবু।'

বড়খোকা: 'কলকাতা থেকে সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—এবার একটু চা খাওয়াও।'

অভয় ব্যস্ত ভাবে বলে ওঠে, 'শুধু চা কেন, আমি তোমার জন্যে চা জলখাবার করে নিয়ে আসছি।'

বড়খোকা: 'আহা, তুমি বুড়ো মানুষ ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার মেয়েকে দিয়েই পাঠিয়ে দাও না।'

অভয় ঘাড় কাত করে: 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই দিচ্ছি।' বলে চলে যায় অভয়।

সীমা রান্নাঘরে জলখাবার সাজায়। পাশে অভয়: '···কলকাতায় বিরাট বাড়ি, বুঝলে? এক আধটা না, গোটা কয়েক। আর বড়খোকা আমাদের গুণের গুণনিধি। এই এতগুলো পাশ দিয়েছে।' দু' হাতের দশটা আঙুলই দেখিয়ে দেয়, গৌরবে হাসে: 'যাও, চা জলখাবার দিয়ে এসো। ওই কাঠের বারকোষের ওপর সব সাজিয়ে নিয়ে যাও।'

সীমা ট্রে-র মতো বড় কাঠের বারকোষ টেনে নেয়।

বসবার ঘর। বড়খোকা আরামকেদারায় এলিয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল।

সীমা ঢোকে। বড়খোকা সোজা হয়ে বসে। সীমা আরামকেদারার কাছে কোন টেবিল না দেখে, খাবার কোথায় রাখবে ঠিক বুঝতে পারে না।

বড়খোকা উঠে দাঁড়ায়, ঘরের একপাশে কয়েকটি চেয়ার ঘেরা টেবিল দেখিয়ে বলে, 'ওখানে, ওই টেবিলে রাখ।'

সীমা টেবিলের কাছে গিয়ে খাবার রাখে। বড়খোকা কাছে এগিয়ে আসে।

সীমা কাঠের বারকোষ থেকে খাবারের থালা, জলের গেলাস, চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে। বড়খোকা সীমার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, সীমা চলে যেতে উদ্যত হয়।

বড়খোকা খপ করে সীমার হাতে টেনে ধরে: 'আরে, চলে যাচ্ছ নাকি?'

সীমা শিউরে ওঠে, কিন্তু বিনীত ভাবে বলে, 'আমি আপনার জন্য রান্না করতে যাব।'

বড়খোকা: 'আরে, এত তাড়া কিসের? এসো, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি।'

সীমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারে না।

বড়খোকা সীমাকে আরও কাছে টানে। সীমা বাধা দেয় না, ওর ঘাড় শক্ত, মাথা নীচু। বড়খোকা অন্য হাতে সীমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরে। সীমার চোখের পাতা নত, যেন বোঁজা।

বড়খোকা: 'তোমার নাম কি?'

সীমা (স্খলিত অস্ফুট স্বরে): 'ময়না।'

বড়খোকা: 'বাহ্, তোমার নামটি তো ভারি মিষ্টি।'

তার মুখ সীমার মুখের কাছে নেমে আসতে থাকে। সীমার সারা শরীরে একটা কুঞ্চনের ঢেউ। হাত থেকে কাঠের বারকোষ মেঝেয় পড়ে যায়।

বড়খোকা: 'তোমার মতো মেয়েকে এখানে মোটেই মানায় না। তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব—' (তার মুখ নেমে আসতে থাকে। তার আলিঙ্গন সীমাকে ঘন সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে থাকে, অনেকটা অজগরের গ্রাসের মতো) 'তোমাকে আমি একটা সুন্দর

বাড়িতে রেখে দেব। তুমি গাড়ি চড়ে বেড়াবে—ঝি, চাকর, ঠাকুর··· (তার আলিঙ্গন সীমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে, মুখ প্রায় সীমার ঠোঁটের কাছে নেমে আসে।)

সীমা (ভয়ার্ত ভাবে) : 'না না, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।'

বড়খোকা তথাপি জোর করে সীমার গালে গাল ঠেকায়।

সীমা জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে খানিকটা দূরে সরে যায়। হাঁপাতে থাকে।

বড়খোকা (হেসে) : 'আরে, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে, ভয় পেয়ে গেলে? এ বাড়িতে আমাকে ভয় পেয়ে গেলে? হা হা-হা··· শোন—।'

সীমা : 'না না, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দিন।' বলেই কাঠের বারকোষটা তুলে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বড়খোকা (হেসে) : 'আরে, আমি তো রাত পোহালেই কলকাতা চলে যাব—তারপরে কলকাতা থেকে তোমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসব।'

সীমা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বড়খোকার কানে সেই নাচের ছন্দের ঝলক বাজে। দৃষ্টি কামনাতুর হয়ে ওঠে। সীমা ঘরের বাইরে বারান্দায় যায়।

বড়খোকা হেসে ওঠে—বিকৃত হাসি।

সীমা বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে অদৃশ্য হয়।

বড়খোকা তখনও হাসে : 'এ বাড়িতে থেকে আমার গ্রাস থেকে ছাড়া পাওয়া এতই সহজ? হা হা হা—।'

হাসতে হাসতে থালাটা তুলে নিয়ে মুখে গোগ্রাসে খাবার গুঁজে দেয়।

অভয় বাগানের নানা জায়গায় সীমাকে খোঁজে আর ডাকে : 'ময়না! কোথায় গেলি?'

কয়েক জায়গায় খুঁজে ডাকতে ডাকতে ব্যস্ত হয়ে ঘোরে।

ময়নাকে দেখা যায় বাঁশঝাড়ের নিবিড় ছায়ায় বসে থাকতে। হাতে কাঠের বারকোষ। দূর থেকে ওর কানে অভয়ের ডাক ভেসে আসে। ময়না উঠে দাঁড়ায়।

অভয় খোঁজে এক দিকে। ময়না অন্য দিক দিয়ে ঘুরে অভয়ের ঘরের দিকে যায়। অভয়ও আর এক দিক দিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

ময়না ঘরে পৌছে যায়। রান্নাঘরের মেঝেয় মস্ত একটা টাটকা রুই মাছ। সীমা তাড়াতাড়ি কাঠের বারকোষটা ঘরের এককোণে নামিয়ে রাখে।

অভয় ঘরে ঢোকে। বেশ একটু রাগতভাব : 'কোথায় গেছলে বল তো? তোমাকে গোটা বাড়ি আর বাগানে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না? ওদিকে জেলে এসে মাছ দিয়ে গেছে, কোটাকুটি রান্না সব বাকি।'...

সীমা : 'বাবা, আমি এখনি সব করে ফেলব।' সে বঁটিটা নিয়ে মাছের কাছে বসে পড়ে।

অভয় : 'কিন্তু বড় খোকাবাবুকে তুমি কি বলেছ? আমাকে বললে : খুড়ো তোমার মেয়ে একটু জংলী আছে।'

সীমা (ছলনার হাসি হেসে) : 'উনি নানা কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, জবাব দিতে পারছিলাম না তো, তাই। তা বাবা, তোমার মেয়ে তো জংলীই।' (হাসে। রুই মাছের মুণ্ডুটা ধারালো বঁটির গায়ে চেপে ধরে।)

অভয়ও এবার হাসে : 'হ্যাঁ, খুব লেখাপড়া জানা ছেলে তো, তাই তোকে জংলী লেগেছে। দেখিস মা, একটু মন জুগিয়ে থাকিস। বড়খোকা আমাদের গুণের গুণনিধি, এতগুলান পাশ দিয়েছে।' আবার হাতের দশ আঙুল দেখায়।

সীমা এক হ্যাঁচকায় রুইয়ের মুণ্ডুটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে, টাটকা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ে। সীমার মুখ শক্ত। মাছের মৃত চোখ দুটি যেন ওকে দেখে।

অভয়: 'এ সব কাজে তোকে আমার কিছু বলার নেই। খুব ভালো করে রাঁধবি, বড়খোকা যেন খেয়ে তোর খুব তারিফ করে।' (বাইরে চলে যেতে যেতে): 'বড়খোকা আমাদের গুণের গুণনিধি।' ...বেরিয়ে যায়।

বড়খোকা দোতলার ঘরে জানালায় দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার অভয়ের খড়ের চালের ঘরের দিকে নিবদ্ধ। হাতের গেলাসে পানীয়। চোখ তার লাল।

পাশে একটা টেবিলের ওপরে হুইস্কির বোতল দেখা যায়। বড়-খোকা টেবিলের কাছে এসে গেলাস রাখে। পাঞ্জাবীটা খুলে খাটের বিছানায় ছুড়ে ফেলে দেয়।

সীমা রান্নাঘরে, উনোনের কড়াইয়ে মাছ ভাজছে। একটা কুকুর দরজার বাইরে শুয়ে। মাছের গন্ধ পেয়ে ঘরের দিকে জুল্ জুল্ চোখে দেখছে।

সীমা তেলের কড়াই থেকে তেল ছিটকে আসা আটকাবার জন্য, তালপাতার পাখা দিয়ে কড়াই আড়াল করে। কুকুরটা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চোখে ভীত দৃষ্টি। সীমা ফিরে তাকায়। কুকুরটা দৌড়ে অদৃশ্য হয়।

একটা ছায়া পড়ে। দরজায় বড়খোকা। কোঁচা গোটানো, গায়ে গেঞ্জি। মুখে হাসি: 'গন্ধেই টের পেয়েছি, মাছভাজা হচ্ছে। বড্ড মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হল, তাই এলাম।'

সীমা মুহূর্তে আড়ষ্ট, নত মুখ, চোখে ভয়।

বড়খোকা: 'দেবে মাছ ভাজা?'

সীমা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়।

বড়খোকা ঘরে ঢোকে।

সীমা উঠে ধোয়া বাসনের গোছা থেকে একটা ঝকঝকে বাটি তুলে নেয়। তারপর বড় থালায় রাখা মাছ ভাজা বাটিতে তুলে দিতে উদ্যত হয়।

বড়খোকা তার গায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। সীমা বাটিতে মাছ ভাজা তোলে, শক্ত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। মদের গন্ধ পেয়ে নাকের পাটা স্ফীত হয়। চোখে আতংক।—'এই নিন।'

বড়খোকা সীমার দুই কাঁধে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে: 'আরে, মাছ ভাজা পরে খেলেও হবে, তোমার সঙ্গে বরং এখন একটু গল্প করি এসো।'

সীমাকে নিজের দিকে ফেরায়। সীমা সরে যাবার চেষ্টা করে।

বড়খোকা জোর করে কাঁধ চেপে ধরে, সীমাকে গায়ের কাছে টানবার চেষ্টা করে।

সীমার হাত থেকে মাছ ভাজার বাটি মেঝেতে পড়ে যায়, মাছ ভাজা ছড়িয়ে পড়ে।

বড়খোকা: 'আরে, এত সতীপনা দেখাচ্ছ কেন? কলকাতায় কত সুন্দরী মেয়ে হোটেল, শুঁড়িখানায় ঘুরে বেড়ায়। অভয় বুড়োর কাছে কি তুমি চিরকাল পড়ে থাকবে?' (বুকের কাছে সীমাকে চেপে ধরে)।

সীমা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকে যায়।

সেই ঘরের বাইরের দরজা দিয়ে অভয় ঢোকে। সীমাকে অস্থির ভাবে ঘরের এক পাশে যেতে দেখে।

অভয়: 'কি হল?'

বড়খোকা (সামলিয়ে নিয়ে): 'কিছু না খুড়ো, তোমার মেয়ের কাছে দুটো মাছ ভাজা চাইলাম, তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।'

অভয় এগিয়ে এসে, ছড়ানো বাটি আর মাছ ভাজা দেখে রাগে শক্ত হয়ে ওঠে, পিছন ফিরে: 'হতচ্ছাড়ি, বড়খোকার অপমান!' (তেড়ে মারতে যায়)।

বড়খোকা: 'আহা-হা, অভয় খুড়ো, কর কি, কর কি। ও বেচারীর কোন দোষ নেই। শহরের মানুষ দেখে নি তো কখনও, হয়তো ভয়-টয় পেয়ে গেছিল। ছ'দিন আমাকে দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'

অভয়: 'ভয়ে কেউ মাছ ছুড়ে ফেলে ছ্যায়?'

বড়খোকা: 'তা নয়, তা নয়, হয়তো পড়ে গেছে। যাকগে, ও মাছগুলো কুকুরকে দিয়ে দিও।'

অভয়: 'আয়, বড় খোকাবাবুকে আলাদা একটা বাটিতে মাছ তুলে দে।'

সীমা বাধ্য মেয়ের মতো এগিয়ে আসে, তারপর নতুন একটি বাটি নিয়ে মাছ ভাজা তুলে বড়খোকার দিকে এগিয়ে দেয়। অভয়ের মুখে হাসি ফোটে।

বড়খোকা (স্বর নামিয়ে): 'এবার বুঝলে তো, আমার কাছে জারিজুরি চলবে না।' সে মাছের বাটি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

অভয়: 'ছি ছি ছি, এত ভয় তোর যে হাত থেকে বাটি পড়ে গেল? বড়খোকা আমাদের কত বড় গুণের গুণনিধি, ওকে ভয় কি? যা, তাড়াতাড়ি রান্না কর।'

সীমা উনোনের দিকে এগিয়ে যায়।

দোতলায় খাটের বিছানায় বড়খোকা খালি গায়ে অসভ্যের মতো শুয়ে আছে। দৃষ্টি জানালা দিয়ে, অভয়ের চালের দিকে। টেবিলের ওপর বড়খোকার খাবারের ভুক্তাবশিষ্ট, একটা বেড়াল সন্তর্পণে থালা থেকে কাঁটা চিবোয়।

বাইরে শেষ বিকালের রোদ। পাখিরা কুলায় ফেরে, গাছে গাছে কিচির মিচির ডাকে। বড়খোকা খাট থেকে নামে। বেড়ালটা ভয় পেয়ে টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে পালায়।

বড়খোকা নীচে নেমে এসে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে অভয়ের চালার দিকে এগোয়।

সীমা ঘরের বাইরে, কিছুদূরে একটা ঝোপের আড়ালে, গাছের নীচে বসা। একটি ছোট গোল আয়না গাছের গায়ে ঠেকানো। সীমা সেই আয়নায় মুখ দেখে। মুখে ভয়ের ছায়া, চোখের কোল বসা। চিরুণী দিয়ে খোলা চুল আঁচড়ায়।

বড়খোকা অভয়ের শূন্য ঘরে খোঁজে, সীমা নেই।

অভয় বাগানের অন্য এক প্রান্তে বসে খুরপি দিয়ে ছোট ছোট চারাগাছ পুঁতছে।

বড়খোকা খালি গা, পাগলের মতো সীমাকে খুঁজছে।

সীমা নিরালায় চুল আঁচড়ায়, হঠাৎ আয়নায় বড়খোকাকে দেখতে পায়। পেয়েই উঠে দাঁড়ায়।

বড়খোকা সীমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েঃ 'তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি, শোন ময়না,—আমার ময়না!...'

সীমা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আপ্রাণ ছাড়াবার চেষ্টা করেঃ 'না, না, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন।'

বড়খোকাঃ 'মুনি ঋষিরাও তোমায় দেখলে ছাড়বে না।' সে জোর করে সীমাকে চুম্বনে উদ্যত হয়। সীমা শেষ শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ছুট্ দেয়, চিৎকার করে ডাকেঃ 'বাবা! বাবা!'...

অভয় সীমার আর্তনাদ শুনে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করেঃ 'কি হল রে?'

সীমা অভয়ের স্বরের লক্ষ্যে ছোটেঃ 'বাবা—বাবা!'

বড়খোকাও তার পিছনে ছোটে।

সীমা অভয়ের কাছে ছুটে আসে। পিছনে পিছনে বড়খোকাও ছুটে আসে। লাল চোখ। সীমাকে দেখিয়ে বলেঃ 'খুড়ো, তোমার

মেয়ে যা তা কুপ্রস্তাব দিতে গেছল, আমাকে ও কি ভেবেছে? আমি খারাপ ছেলে?'

অভয় (রাগত স্বরে): 'কি—তোমাকে খারাপ ছেলে ভাবে? কুপ্রস্তাব দেয়?'

বড়খোকা: 'হ্যাঁ, তোমার মেয়ে জঘন্য চরিত্রের—.'

সীমা: 'বাবা বাবা, আমার কথা একটু শোন। তোমাদের এই বড়খোকাবাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে—'

অভয়: 'চোপ হারামজাদী, বড়খোকা আমাদের গুণের গুণনিধি, তার নামে মিছে কথা?' বলেই পায়ের কাছ থেকে ধারালো কুড়ুলটা তুলে নেয়: 'তোকে আজ কুপিয়েই শেষ করব।'

বড়খোকা সীমার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নেয়: 'থাক খুড়ো, মারধোর কোরো না, ওকে আমিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেব।' (সীমাকে) 'চল, আমার সঙ্গে।'

সীমা: 'না না, তুমি আমাকে বেইজ্জত করবে।'

অভয়: 'কি—ফের বড়খোকার নামে খারাপ কথা!' (তার কুড়ুল উদ্যত হয়।)

সীমা বড়খোকার নোংরা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে।

বড়খোকা: 'খুড়ো, মেয়েটা পালাচ্ছে।'

অভয়: 'কোথায় পালাবে, ওকে আমি খুন করব।'

সীমা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। কুড়ুল হাতে অভয়ও দৌড়ায়।

সূর্য অস্ত যায়। সীমা ভেড়ি বাঁধের ওপর দিয়ে ছোটে, সূর্য তার গায়ে, নদীর জলে—রক্ত—তরঙ্গ। সীমা ছোটে—ছোটে—ছুটতে থাকে।

চলুন, আবার ফিরে যাই কালীচরণের নৌকার সেই ঘরে। বর্তমানের পটভূমিতে, যেখানে সীমা, শম্ভুকে ওর জীবনের আর একটি অতীত পট শুনিয়ে, নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। নৌকার ঘরের ভিতরে সীমা যেখানে বসে ছিল, সেখানেই বসে আছে, চোখে তার আতংকের ছায়া।

শম্ভুর চোখে কৌতূহল : 'তারপর?'

সীমা (সনিঃশ্বাসে) : 'তারপর তোমাদের এই নৌকোয়। কিন্তু আমি জানি, সেই বুড়ো এখনও আমাকে কুড়ুল দিয়ে কোপাবার জন্য ছুটে আসছে। তুমি কি আমাকে সেই বুড়োর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে?'

শম্ভু : 'পারব। বুড়োকে আমিই কুপিয়ে মারব, তারপরে তোমাকে বিয়ে করব।'

সীমা : 'বেশ, তাহলে মণিমহেশপুরে আমি যখন নামব, তুমিও সেখানে নেমো।'

শম্ভু : 'সেখানে কি আছে?'

সীমা : 'সেখানে আমার বাবা মা থাকত, আমাদের পোড়ো ভিটে দেখতে যাব।'

কালীচরণের নেপথ্য কণ্ঠ ভেসে আসে : 'শঙ্কর এলি?'

শঙ্করের নেপথ্য কণ্ঠ : 'হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে।'

কালীচরণের নেপথ্য কণ্ঠ : 'এই মাঝিরা, দাঁড় ধর, দাঁড় ছাড়, আর দেরী নয়।'

শম্ভু উঠে দাঁড়ায়, একটা সিগারেট ধরায় : 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, বাবা এখুনি খোঁজ করবে। তাহলে ওই কথা রইল।'

সীমা ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসে।

শম্ভু সিগারেট মুখে বেরিয়ে আসে। হাবা সামনেই দাঁড়িয়ে। শম্ভুকে দেখে তার সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ে, অঁক অঁক শব্দ করে।— 'এ্যাম্‌মা, এ্যাম্‌মা, এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা' আঙুল দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখায়। ঠোঁট নেড়ে ঢোঁক গেলে, শম্ভুর গায়ে খোঁচা দেয়, সিগারেট দেখায়।

শম্ভু মারতে উদ্যত হয়, 'শালা, সিগ্রেট খেতে দেখলেই, এ্যামা এ্যামা করবে।'

হাবা তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে।

শম্ভু সিঁড়ি দিয়ে ছই মাচায় উঠতে উঠতে সিগারেটটা হাবাকে ছুড়ে দেয়।

হাবা সিগারেটটা লুফে নিয়ে উল্লাসের ধ্বনি করে, তারপর চপ্ চপ্ করে টানে।

শঙ্কর ছোট বাছাড়ি নৌকো থেকে বড় নৌকায় উঠে আসে। মাঝিরা সব যে যার জায়গা নেয়। কয়েকজন বড় নোঙরের শেকল টেনে তুলতে থাকে।

হালের কাছে কালীচরণ: 'তাড়াতাড়ি, জলদি কর সব।'

শঙ্কর নীচের পাটাতন থেকে, ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকায়। সীমাকে দেখতে পায়। সীমা জানালার কাছে বসে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে।

জীবন কেবল মায়াময় প্রপঞ্চক নয়, মহামায়ায় আবিষ্ট হয়ে আছে এই গ্রহের জীবসমূহ। এবার এই নৌকাতেই দেখুন, সীমার—থুড়ি, ময়নার জীবনে নতুন পটের শুরু হচ্ছে। এই পটটা কি ময়নার জীবনের অতীতের সঙ্গে কোন পরম্পরা বজায় রেখেছে? সে তো ভবিষ্যতের গর্ভে।...আপাতত মহামায়ার আবির্ভাব কোথায় কি ভাবে ঘটছে, তাই দেখা যাক।

নৌকা চলতে আরম্ভ করেছে।

সময় ঠিক অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটে চারটের বেশি না।

ইস্পাত রঙ জলে ছোট ছোট ঢেউ, সূর্যের ছটা। দূরে দূরে ছোট ছোট জেলে নৌকা মাছ ধরছে। বহুদূরের বাঁকে একটি লঞ্চ চলে যেতে দেখা যায়।

কালীচরণ হালের সামনে আসনে বসে, যেখান থেকে সব দিকে নজর রাখা যায়। সে দূরের দিকে তাকিয়ে কখনও মাথা চুলকোচ্ছে। কখনও বুকে পেটে খস্ খস্ করে চুলকোচ্ছে। তার অভিব্যক্তিটা দেখে মনে হচ্ছে, সে কি করবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না।

সাঁইদার সত্য মাঝি কল্কের তামাক জ্বালিয়ে হুঁকোর ডগায় বসিয়ে কালীচরণের দিকে এগিয়ে দেয়: 'নেন গো কত্তা, তামুক খান।'

কালীচরণ চমকে ওঠে: 'অ্যাঁ? তামুক?' হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়েও থমকে যায়: 'মনটা ফস্ফস্ করছে কেন বলতো হে সাঁইদার? অ্যাঁ? বিত্তান্তটা কি?'

শম্ভু ওপরের ছইমাচায় উপুড় হয়ে শুয়ে নীচের পাটাতনে শঙ্করকে দেখছিল।

শঙ্করের দৃষ্টি খোলা ঘরের দরজার দিকে। ঘরের ভিতর সীমাও খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। শম্ভু যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে খোলা দরজার দিকে দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সীমাকে চোখে পড়ছিল না। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে তার গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটছিল। তার মনের ধারণা, সীমা এখন তারই। সে গুন গুন করে ভেঁজে উঠল:

> বেল পাকলে কাকে ঠোকরায়
> বেলের তাতে কী এসে যায়
> বেল দোলে, বেল টলটলে
> কাকের ঠোঁট ভোঁতা মেরে যায়।...

শঙ্কর ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে শম্ভুর দিকে তাকায়। শম্ভু চোখ কুঁচকে হাসে। হাবা কী বোঝে—গাঁ গাঁ শব্দে হাসে। দাঁড়িদের দাঁড় পড়ে ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্।

হালের কাছে কালীচরণ, জান্তব ভাবে গাল আর চিবুক চুলকোয়।

সত্য মাঝি : 'কত্তা একটু তামুক খান, মগজ সাফ হয়ে যাবে।'

কালী : 'অ্যাঁ? বলছ?' হুঁকোর দিকে হাত বাড়ায়, আর সেই মুহূর্তেই তার চোখে মুখে একটা জান্তব খুশি ঝলকে ওঠে : 'অ্যাঁ! অ্যাই মনে পড়েছে! তাই তো ভাবি শালা, আমি কালীচরণ, আমার মনের মন কলা পোড়া কে খেল?'

সত্য মাঝি : 'মন কলা পোড়া?'

কালী : 'হ্যাঁ, মন কলা পোড়া খেয়ে নিয়েছে ওই মেয়েটা।'

শম্ভু কালীচরণের দিকে ফিরে তাকায়।

সত্য মাঝি : 'কোন্ মেয়েটা?'

কালী (খেঁকিয়ে) : 'কোন্ মেয়েটা আবার? নৌকোয় মেয়ে ক'টা আছে, অ্যাঁ?' হুঁকোটা মাঝির হাত থেকে কেড়ে নেয় : 'বাহ্ জব্বর মেয়ে, যাও তো সাঁইদার, নীচে গিয়ে মেয়েটাকে বল, আমার জন্য ছোলা মুড়ি নিয়ে আসতে। হা—বেশ ভালো করে চিবনো যাবে, যাও, যাও।'

সত্য মাঝি উঠে দাঁড়ায়।

শম্ভু হতবাক মুখে কালীচরণের দিকে তাকায়।

সাঁইদার ওপর থেকে নেমে, নীচে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

সীমা ঘরের মধ্যে আনমনে ছিল। মাঝিকে দেখে চমকে ওঠে।

সাঁইদার : 'কত্তা তোমাকে ডাকতিছে গো। তার জন্যি ছোলা মুড়ি নিয়ে ওপরে এসো।'

সীমা : 'কে কত্তা?'

সাঁইদার : 'কত্তা আবার কে? মালিক—আমাদের সকলের মালিক। তার জন্যি ছোলা মুড়ি নিয়ে এসো।'

সীমা এক মুহূর্ত ভাবে, ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকায়। ঠোঁটের কোণে হাসি। উঠে দাঁড়ায়।

নীচের পাটাতনে শঙ্কর অবাক চোখে সাঁইদার সত্য মাঝির দিকে তাকায়ঃ 'এই সত্যদা, শোন।'

সাঁইদার শঙ্করের কাছে এগিয়ে আসে।

শঙ্কর: 'মেয়েটাকে কী বলছিলে?'

সাঁইদার: 'কত্তা তাকে ডেকেছে, তার হাতে ছোলা মুড়ি খাবে।'

শঙ্কর: 'কেন?'

সাঁইদার (ঠোঁট টিপে হাসে): 'কী জানি! বলছিল, তোমার বাবার মনের মন কলা পোড়া না কি মেয়েটা খেয়ে নিয়ে বসে আছে।' স্বর নীচু করে আবার বলে, 'বশীকরণ কি না কে জানে।'

শম্ভু ভুরু কোঁচকানো, কালীচরণের দিকে তার অবাক কৌতূহল দৃষ্টি। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। কালীচরণ লাল চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হুঁকোয় টান দেয়, ধোঁয়া ওড়ে।

শম্ভু ছই মাচা থেকে নীচে নামার মইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময়েই সীমা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, হাতে বেতের ডালায় ছোলা মুড়ি। শঙ্করের দিকে তাকায়। ঠোঁটে তার হাসি। শঙ্করও তাকায়, কিন্তু সীমার হাসির অর্থ বুঝতে পারে না।

সীমা ওপরে ওঠার মইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। শম্ভু মই থেকে নেমে পাশে দাঁড়িয়ে, সীমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকায়।

সীমার ঠোঁটের কোণে তেমনি হাসি, ও মইয়ের ধাপে পা বাড়ায়।

দাঁড়ি মাঝিদের সকলের দৃষ্টি সীমার দিকে। কালীচরণ মইয়ের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়: 'এসো এসো, আমার হুরি, আমার পরী। হা—হা—হা—' এগিয়ে এসে সীমার হাত ধরে টেনে নিজের জায়গায় নিয়ে যায়: 'বাহ্, ছোলা মুড়ি নিয়ে এসেছ? বাহ্, বাহ্, বোস এখানটিতে।'

সীমাকে বসিয়ে দেয় হালের কাছে, নিজেও বসে: ছোলা মুড়ি থাবায় নিয়ে মুখে পোরেঃ 'চাক্কু অ্যাঁ! কী বল হে সাঁইদার! আমার খুব ভালো লাগছে। তুমি কেন মিছিমিছি ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকবে?'

সীমার চোখে মুখে লাস্য, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'তুমিই তো বকে ধমকে ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিলে।'

কালী : 'আর রাখব না। হা—হাহা—এখন থেকে তোমাকে খালি আমার কাছেই রেখে দেব, তাহলেই আর তোমাকে ঘরে ঢোকাতে হবে না।'

বলে সীমার গা ঘেঁষে বসে : 'এখন থেকে খালি আমার কাছে থাকবে, বুঝেছ? খালি আমার কাছে।'

শম্ভু এগিয়ে গিয়ে শঙ্করের পাশে বসে পড়ে। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি : 'বুড়োর মতলবটা কী বল দিকিনি দাদা?'

শঙ্কর গম্ভীর : 'যা খুশি মতলব হতে পারে। তা নিয়ে আমরা ভেবে কি করব?'

শম্ভু : 'বুড়োর নিশ্চয়ই ভীমরতি ধরেছে।'

শঙ্কর : 'তাতেই বা কী? বাপের সম্পর্কে কথা বলতে হয়, ভালো করে বল্।'

শম্ভু : 'আরে রাখ, রাখ তোর ভালো কথা। তুই কী বুঝবি আমার ভেতরে এখন কী হচ্ছে! বুড়োর ও সব মামদোবাজী আমি মেনে নেব না।'

শঙ্কর : 'মেনে নিবি না তো করবি কি?'

শম্ভু (ছুরি মারার ভঙ্গীতে) : 'ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।'

শঙ্কর : 'মারব এক থাপ্পড়।'

শম্ভু : 'বেশি তেড়িবেড়ি করিস না, তাহলে তোকেও ফাঁসিয়ে দেব, দেখিস।'

শঙ্কর শম্ভুর ক্ষ্যাপামি দেখে হেসে ওঠে।

শম্ভু : 'তোরও নিশ্চয় বাবার ওপর রাগ হচ্ছে দাদা, তুই চেপে যাচ্ছিস।'

শঙ্কর : 'আমার কী হচ্ছে কিছুই বলতে চাই না, চুপচাপ দেখে যাওয়াই সব থেকে ভালো।'

শম্ভু : 'তা বলে এ সব দেখতে হবে?'

শঙ্কর এ কথার কোন জবাব দিল না।

কালীচরণের চোখে উৎফুল্ল লালসার ঝলক। সীমার ডানায়, এক পাশের জামাহীন খোলা কাঁধে আঙুল বোলায়! 'হা—হা—হা গোলা পায়রার মতন নরম।'

সীমার ঠোঁটে হাসি, চোখে লাস্য। কালীচরণের মোটা ভুরু দুটো হঠাৎ কুঁচকে ওঠে: 'অ্যাঁ? এমন অঙ্গে একটা ধুতি? গায়ে এক চিমটি গহনা নেই! না—না—না—না, এ হতে পারে না।'

সীমা : 'কে দেবে জামা গহনা? কোথায় পাব।'

কালী : 'আমি—আমি, আমি কালীচরণ সরকার দোব। হা—হা—হা,—আজই দেব, এখনই দেব। তোমাকে আমি মনের মতন করে সাজাব।' আপন মনে বিড় বিড় করে, 'তাই তখন থেকে ভাবছি, মনের কোথায় যেন তোলপাড় করছে। একেই বলে মনের ভেতর মন! মেয়েটার জন্যই মন ফস্‌ফস্ করছিল।'

সীমা : 'অনেক শাড়ি গহনা জমা আছে বুঝি?'

কালী : 'না না, জমা থাকবে কেন? কোথায় থাকবে, কার জন্য থাকবে? কিনে দেব আমি। আর তা আজ, এখনই।' সাঁইদারের দিকে ফিরে তাকায়: 'সাঁইদার, কৈলেসখালির গঞ্জ তো কাছেই, তাই না?'

সাঁইদার : 'ওই তো দেখা যায় কৈলাসখালির গঞ্জ।'

দূরের তীরে বাঁধের ধারে অনেকগুলো চালাঘর, আর নদীর ধারে ছোট বড় নৌকা দেখা যায়। মাঝি বলে, 'আজ তো কৈলেসখালির গঞ্জে হাটবার।'

কালীচরণ (ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে) হাঁকে : 'এই মাঝিরা, দাঁড় টানা বন্ধ কর, নৌকো থামাও। আমি বাছাড়ি নৌকো নিয়ে কৈলেস-খালির হাটে যাব।'

মুহূর্তে গোটা নৌকায় পরিবর্তন সূচিত হয়। সবগুলো দাঁড় থেমে যায়। নৌকার গতি মন্থর হয়ে আসে।

কালীচরণ : 'বাছাড়ি নৌকো এগিয়ে নিয়ে এসো। নোঙর ফ্যালো এখানে।' (সীমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করায়) : 'হা—হা—হা, এসো, কৈলেসখালির গঞ্জ থেকে তোমাকে সাজিয়ে নিয়ে আসব—তবে হ্যাঁ, গঞ্জে এখন ঝুটো গহনা মিলবে। তা'পরে তোমাকে আসল সোনা চাঁদির মাল গড়িয়ে দেব। এসো।' সীমাকে নিয়ে সে মইয়ের দিকে এগোয়।

শঙ্করের পাশ থেকে শম্ভু রুখে উঠে দাঁড়াতে যায় : 'বুড়োকে আজ জলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব '

শঙ্কর শম্ভুর হাত চেপে ধরে : 'চুপ করে বোস্, যা হচ্ছে দেখে যা! মেয়েটা কি বাবাকে বাধা দিচ্ছে ?'

তাদের দুজনের পিছনে হাবা অবিকল কুকুরের কান্নার মতো কুঁই কুঁই শব্দ করে।

শম্ভু ঘুরে তাকে একটা লাথি মারে। সে নিঃশব্দে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়।

কালীচরণ বাছাড়ি নৌকায় সীমাকে নিয়ে গলুইয়ের কাছে বসে। সাঁইদার নিজে বৈঠা বাইতে থাকে।

কালী : 'হা—হা—হা, সান্ সান্ বাওহে সাঁইদার, সান্ সান্ বেয়ে চল।

*　　　*　　　*

কৈলাসখালির গঞ্জ। সীমার হাত ধরে কালীচরণ বাঁধের ওপর দিয়ে গঞ্জের দিকে হেঁটে যায়। চারপাশের সবাই অবাক কৌতূহলে তাকিয়ে দেখে। সীমার প্রতিই সকলের নজরটা বেশি।

লোকেরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে :

১ম : 'লোকটা দিলদারপুরের কালীচরণ আড়তদার না ?'

২য় : 'বটেই তো। শুধু কি আড়তদার ? জোতদার, চালানদার, মালদার—।'

৩য় : 'ওই হোল হে। কিন্তু অমন একটা ছুঁড়িকে নিয়ে এলো কোথা থেকে ?'

৪র্থ : 'কোথা থেকে ! তোমাদের যেমন কথা। দানা ছড়ালে আবার বুলবুলির অভাব ? আর কালীচরণের কী দানার কোন অভাব আছে ?'

কালীচরণ মদের ভাঁটিখানার দিকে এগিয়ে যায়। সীমা গতি মন্থর করে : 'ওখানে—ওদিকে কেন যাচ্ছ ?'

কালী : 'হ'—হাহা, দু' বোতল মাল কিনতে হবে না ?'

সীমা : 'তুমি মদ খাবে ?'

কালী : 'হা—হা, মানুষ মরলে পোড়াতে হয়, মন মজলে মাল টানতে হয়, জানো না ?'

নেপথ্যে একটা খ্যামটার তালে বাজনা আর গানের সুর ভেসে আসে।

সীমা : 'মাতালদের আমার ভীষণ ভয় করে।'

কালী : 'হা—হাহা,—আমাকে তোমার কোন ভয় নেই। আমি এখন তোমার পোষ মানা কালীচরণ।'

সীমা অস্ফুটে বলে ওঠে, 'ষাঁড় !'

কালীচরণ জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে ?'

সীমা মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু না।'

ভাঁটিখানার কাউন্টার। লোহার জালের পিছনে, তাকের ওপর থাকে থাকে মদের বোতল সাজানো।

দোকানের ভিতরে গদীর ওপর বসে থাকা, খালি গা নাদুস নুদুস লোকটি খুশি গলায় আপ্যায়ণ করে, 'সরকার মশাই যে। আসুন আসুন, বসবেন আসুন।'

কালী: 'এখন আমার আসবার বসবার সময় নেই দাসমশাই।' (পকেটে হাত ঢোকায়): 'দেখি বাবা, এক নম্বরী দুটো বোতল দাও তো।'

দাসমশাই: 'ওরে, ভালো দেখে দিস, সরকার মশাইয়ের ইস্পেশাল মাল।'

সঙ্গে সঙ্গে কালো কুচকুচে রোগা ঢ্যাঙামত একটা লোক ভিতর থেকে দুটো বোতল বের করে এনে দেয়। কালীচরণ থুথু দিয়ে টাকা গুনে দেয়।

তার পরে দুই বগলে দুটো বোতল নিয়ে, এক হাতে সীমাকে ধরে, যেদিকে বাজনা বাজছে, সেদিকে এগিয়ে যায়: 'চল তো, দেখি তো, কিসের রঙ্গ হচ্ছে।'

এক জায়গায় বেশ ভিড়। দেশ-দেশান্তরের মাঝি মাল্লা গঞ্জের নানা ধরনের মজাখোর লোকের ভিড়ের মাঝখানে একটি মেয়ে খ্যামটা নাচছে। দুটি মেয়ে গান গাইছে, দুজন পুরুষ হারমোনিয়ম তবলা বাজাচ্ছে। চারদিকে উল্লাসের ধ্বনি, চিলের ডাকের মতো শিস দিচ্ছে কেউ কেউ।

ভিড়ের লোকেরা বিশেষ করে সীমাকে দেখেই নাচ দেখতে যাবার জায়গা করে দেয়।

কালী: 'বাহ্, বেশ বেশ!'

সীমা ঠোঁট কোঁচকায়: 'বিচ্ছিরি!'

কালী: 'আরে এই তো জীবন! শ্মশানে পেতনি নাচে, এখানে খেমটি নাচে। হা—হা—হা।'

সে সীমার হাত ছেড়ে, একটা বোতলের ছিপি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে, ঢক ঢক করে গলায় ঢালে।

সীমা হাত ছাড়া পেয়েই এক দিকে দৌড় মারে।

কালী : 'এই মেয়েটা—কী যেন নাম, এই—।' সীমার পিছনে ধাওয়া করে।

ভিড়ের লোকেরা হাসাহাসি করে, বলাবলি করে : 'এই রে, কালীচরণ কত্তার মেয়েমানুষ ভেগেছে।'

সীমা দ্রুত পায়ে হাঁটে।

কালীচরণ ছুটে প্রায় তাকে ধরে ফ্যালে : 'এই, হুরি! আমার পরী! কোথায় যাচ্ছ? তোমার জন্য এখন শাড়ি গহনা কিনতে যাব যে! এসো এসো।'

সীমা থেমে যায়।

কালীচরণ এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে : 'হা—হা—হা—কোন ভয় নেই। চল, তোমাকে রঙীন রঙীন শাড়ি কিনে দেব, আর জেল্লাদার গহনা।'

সীমাকে নিয়ে এগোতে এগোতে বোতলে চুমুক দেয় কালীচরণ, মাঝে মাঝে হোঁচট খায়।

সন্ধ্যা নেমে আসে। বাছাড়ি নৌকা বড় নৌকার কাছে ফিরে আসে।

সীমার গলায় হাতে কানে গহনার ঝিলিক। নাকে নাকছাবি। কোলের ওপর কয়েকটা রঙীন শাড়ি।

কালীচরণ প্রচণ্ড মাতাল, কোন রকমে পাটাতন থেকে উঠে সীমার হাত ধরে টানে : 'এসো, চল, ঘরে গিয়ে তুমি আমাকে খেতে দেবে, আমি খাব। আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

সীমা (খিলখিল করে হেসে ওঠে) : 'বিয়ে! তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

কালীচরণ কোন জবাব দেয় না। টলতে টলতে মাঝিদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই শুয়োরের বাচ্ছারা—আমাদের ধরে তোল।'

বড় নৌকায় একটা ব্যস্ততা জেগে ওঠে।

কোল আঁধারের এক পাশে শঙ্কর আর শম্ভু।

কালীচরণ সীমাকে নিয়ে বড় নৌকায় ওঠে: 'এই—শঙ্করা শম্ভে কোথায়? শুনে রাখ, এই মেয়েকে আমি বিয়ে করব—হ্যাঁ, বিয়ে—ও আমার বউ।'

এক পাশ থেকে শম্ভু কালীচরণের দিকে রুখে ছুটে যেতে উদ্যত হয়। শঙ্কর তাকে চেপে ধরে: 'এই, কি করছিস গাধা! বাবা নেহাতই মাতলামি করছে।'

কালীচরণ সীমাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। সশব্দে দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দেয়। ঘরের মাঝখানে ধপাস্ করে বসে: 'এই মেয়েটা, আলো জ্বালো, আলো জ্বেলে আমার কাছে এসে বসো।'

সীমা হাতের শাড়িগুলো একপাশে রেখে রান্নার পার্টিশনের ওপারে গিয়ে, হ্যারিকেন ধরিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে আলো ছড়ায়।

কালীচরণ আধবোজা লাল চোখে সীমার দিকে তাকায়। হাত টেনে ধরে কোলের কাছে বসায়: 'বসো, আমার হুরি। শোন, কালীচরণ যা করব বলে, তাই করে। আমি বলেছি তোমাকে বিয়ে করব—তো তোমাকে বিয়ে করবই।'

সীমার ভঙ্গিতে লাস্য: 'আমাকে তুমি বিয়ে করবে! কিন্তু আমার কথা তো তুমি কিছুই জানো না, কিছুই শোন নি।'

কালীচরণের চোখ মত্ততায় বোজা: 'তোমার কথা? তোমার আবার কী কথা?'

সীমা: 'আমার অনেক কথা আছে। না শুনলে পরে ভাববে, আমি তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মজিয়েছি।'

কালীচরণ উঠে বসতে গিয়ে অসমর্থ হয়, জোর করে তাকাবার চেষ্টা করে: 'ওহ্, তাই বুঝি? বেশ বেশ, বল তোমার কী কথা আছে, বল শুনি।'

সীমা হ্যারিকেনের দিকে তাকায়।

হ্যারিকেনের সলতের আগুন যেন বিশাল হয়ে ওঠে।

সীমার চোখ দুটোও সেই রকম বিশাল হয়ে একবার জ্বলে ওঠে।

সীমা: 'জানো, আমার সংসারে কেউ নেই। দয়া করে এক বাগান-বাড়ির মালী আমাকে মেয়ের মতন করে তার কাছে রেখেছিল। কিন্তু তার বাবু আমাকে বেইজ্জত করতে চেয়েছিল, আর মালী ভেবেছিল, আমিই তার বাবুকে নষ্ট করেছি।...এই ভেবে, রেগে সে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মারার জন্য আমাকে তাড়া করেছিল...'

কালীচরণের স্বর অস্পষ্ট জড়ানো: 'হুঁ—ম্! তা তুমি কি করলে?'

সীমার দৃষ্টি হ্যারিকেনের সলতের দিকে: 'আমি পালালাম, ছুটতে, ছুটতে...'

আপনারা কি কিছু বুঝতে পারছেন? পারছেন না? না পারবারই কথা। আমি আপনাদের প্রথমেই বলেছিলাম, এবারি আপনাদের আমি এক বিস্ময়কর জীবন নাট্যের প্রবাহে টেনে নিয়ে যাব। মায়াময় প্রপঞ্চকতার এ এক আদি নাটক। আদিমও বলতে পারেন। তা না হলে, সীমার এই আচরণেরই বা কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

সীমা ওর জীবনের আর এক অধ্যায় কালীচরণকে শোনাচ্ছে। ওর মুখ থেকে শোনার দরকার নেই। চলুন, সেই অতীতের অধ্যায়ে আপনাদের আমি নিয়ে যাই। প্রত্যক্ষ করুন আপনারা নিজেরাই। দৃশ্যগুলোকে আমি পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি।

একটা ভিড়ের লঞ্চে সীমাকে যাত্রীদের মধ্যে গাদাগাদি অবস্থায় দেখা যায়।...একটা ভিড়ের বাসে সীমাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হতে দেখা যায়। তার পরের দৃশ্যেই একটা রেলওয়ে স্টেশন।

একটা রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অনেক শ্রমজীবি দরিদ্রদের মধ্যে সীমাকে দেখা যায়। এখন তাকে আর আগের মতো চেনা যায় না। ধূলিমলিন রুক্ষ চেহারা, চুলে জট, ক্ষুধার্ত, চোখের কোল বসা। গাড়ি চলতে থাকে।

তরাই অঞ্চলের চা বাগান, পাহাড়ের সীমানায়। সীমাকে দেখা যায় একদল মেয়ে পুরুষদের থেকে অনেকটা পিছনে হাঁটছে। চোখে মুখে ভয় ও ত্রাস। থেমে থেমে যায়, আশে পাশে তাকায়।

দলের একটি মেয়ে থমকে দাঁড়ায়, সীমাকে বলে: 'তুমি কুন্ বাগানে কাজ কর গ?'

সীমা (অবাক): 'বাগান! কিসের বাগান?'

মেয়েটি (হাসে): 'ক্যানে, এই যে সব চায়ের বাগান, দেখছ না?'

সীমা: 'ও, এগুলো বুঝি চায়ের বাগান?'

মেয়েটি (আরো জোরে হাসে): 'তুমি চা বাগান চিন নাই ক্যানে?'

সীমা অবোধ ভাবে মাথা নাড়ে।

মেয়েটি: 'তবে এখানকে এলে ক্যানে?'

সীমা: 'তোমরা রেলগাড়িতে করে আসছিলে দেখে, আমিও তোমাদের সঙ্গে চলে এলাম।'

মেয়েটি (হাসে): 'তাজ্জব মেয়্যা বটে তুমি হে! তুমার সাথে কে আছে বটে?'

সীমা (ঘাড় নাড়ে): 'কেউ তো নেই।'

মেয়েটি (অবাক): 'তুমি একা? মরদ বিটা বিটি কেউ নাই?'

সীমা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

মেয়েটি: 'তবে ইখানকে তুমি কি করবে? চা বাগানে কাজ লিবে?'

সীমা : 'আমাকে কাজ দেবে?'

মেয়েটি : 'ক্যানে দিবেক নাই?' হাত তুলে সামনের দিকে দেখিয়ে দেয় : 'উইখানটিতে যাও, উয়াদের যেঁইয়ে বল, লিশ্চয় কাজ মিলবেক।'

সীমা মেয়েটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকায়।

দিগন্তবিস্তারী চা বাগানের ওপারে শ্রমিকদের ধাওড়া, কিছু মানুষজন দেখা যায়।

সীমা মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে দেখতে যায়। কিন্তু মেয়েটি তখন তার দলের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে চলে গিয়েছে। সীমাকে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তান্বিত দেখায়; তারপর মেয়েটির নির্দিষ্ট পথেই পা বাড়ায়।

সীমা ধাওড়ার সামনে আসে। মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বৃদ্ধ—অনেকেই আশে পাশে ছড়ানো। কেউ কেউ তার দিকে ফিরে তাকায়।

একটি যুবতী, মাথার খোঁপায় লাল ফুল গোঁজা, ভালো রঙীন শাড়ি জামা পরা, একটি ঘরের দরজায় বসে, দু'তিনজন মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে।

একটু দূরে গাছতলায় খাটিয়ার ওপরে বসা হাফপ্যান্ট পরা গেঞ্জি গায়ে মাঝবয়সী একটি লোক সীমার দিকে তাকায়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে মুখ ফিরিয়ে ডাকে : 'লছমী।'

দরজার কাছে বসে থাকা, রঙীন শাড়ি পরা, মাথায় লাল ফুল গোঁজা লছমী মুখ তুলে লোকটির দিকে তাকায়। লোকটি ইশারায় সীমাকে দেখায়।

লছমী সীমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। কাছে এসে সীমাকে জিজ্ঞেস করে : 'তুমি কে বটে, কুন্ বাগিচায় কাজ কর?'

সীমা (মাথা নাড়ে) : 'কোন বাগিচায় কাজ করি না, কাজ চাই।'

লছমীর চোখে ঝিলিক হানে। সীমার গোটা শরীরের দিকে তাকায়। বলে, 'সঙ্গে কেউ নাই ?'

সীমা মাথা নাড়ে।

লছমী : 'তুমাকে দেখ্যে বড় দুঃখী মেয়্যা লাগছে গ। মনে লিচ্ছে, কত্তো দিন তুমার খাওয়া নাই, চান নাই।'

লছমীর কোমল স্বরের সহানুভূতি ও অনুকম্পায় সীমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

নৌকার মধ্যে হ্যারিকেনের আলোর শিখা দপদপিয়ে জ্বলছে।

সীমা তাকিয়ে দেখে, কালীচরণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

সীমা কালীচরণের মাতাল ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, ফিক্ করে অদ্ভুত একটু হাসে : 'কালীচরণ তুমি ঘুমোচ্ছ। কারোর জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার কথাই তুমি কোন দিন শুনতে চাও নি, চাও না—তোমার কাছে কারোরই কোন দাম নেই···হায় কালীচরণ, আজ আমার সামনে তুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছ।'

বলতে বলতে সীমার দুই চোখ হ্যারিকেনের শিখার মতো জ্বলে ওঠে, তলপেটের কাছ থেকে টেনে বের করে ভোজালি সদৃশ সেই ছুরি। ছুরির গা থেকে ন্যাকড়া খুলতে থাকে : 'কালীচরণ, কে তোমাকে আজ আমার সামনে ঘুম পাড়িয়ে দিলে ?'

ন্যাকড়া খোলা হয়ে যায়, ছুরি ঝল্কিয়ে ওঠে। সীমার চোয়াল শক্ত : 'যে-ই তোমাকে আজ ঘুম পাড়িয়ে থাক, সে জেনে শুনেই পাড়িয়েছে, কারণ তোমার এ ঘুম আর কোন দিন ভাঙবে না।'

বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে কালীচরণের পেট বুক ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দেয় সীমা।

কালীচরণের পেট বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোয়—সে আর্তনাদ করে ওঠে, 'আহ্, আঁ—আঁ—আঁ…খু‥ ন্!'…

সীমা ঝটিতি হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেয়। অন্ধকার নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অতি দ্রুত দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে পড়ে।

কালীচরণ তখন 'খুন খুন' শব্দে গোঙাচ্ছে। ঘরের বাইরে সকলের ছোটাছুটি।

শঙ্কর: 'বাবার চিৎকার। আলো—আলো—!'

একজন মাঝি আলো নিয়ে আসে। শঙ্কর হ্যারিকেন নিয়ে ঘরের মধ্যে যায়। মৃত রক্তাক্ত কালীচরণ।

শঙ্কর: 'বাবা, বাবা!'

শম্ভু ছুটে আসে: 'কী হয়েছে?'

শঙ্কর: 'বাবা খুন হয়েছে। নিশ্চয়ই তুই করেছিস।'

শম্ভু: 'আমি না তুই? ওই ছুঁড়িটার জন্যে—।'

ওদের কথার মাঝখানেই বাইরের জলে ঝপাং শব্দ হয়।

শঙ্কর: 'কে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল?'

দুজনেই বাইরে ছুটে আসে। একজন মাঝি বাতি তুলে জলের দিকে তাকায়। শঙ্কর তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

মাঝি: 'বড়দা বাবু, সেই মেয়েটা সাঁতরে পালাচ্ছে। ওই ছাখ।'

শঙ্কর চিৎকার করে: 'শম্ভু শিগ্‌গির আয়, মেয়েটা সাঁতরে পালাচ্ছে। ও-ই বাবাকে খুন করেছে।'

সে তাড়াতাড়ি অন্য মাঝিদের বলে: 'শিগগির বাছাড়ি নৌকা নিয়ে মেয়েটাকে ধরো।'

মাঝিদের হৈ হল্লা চিৎকার···ছুটোছুটি। হ্যারিকেনের আলো ছাড়াও টর্চের আলো জ্বলে। শঙ্কর শম্ভু বাছাড়ি নৌকার দিকে ছুটে যায়।

চারদিকে মেহেদীর বেড়া ঘেরা। রাস্তার ওপরে খোলা গেট; মাথার ওপরে একটি বোর্ড লাগানো। বোর্ডে লেখা রয়েছে 'মণিমহেশপুর থানা।'

ইংরেজিতে 'মণিমহেশপুর পি. এস.।' বোর্ডের দু'দিকে দুটি লালচে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় বোর্ডের লেখা কোন রকমে পড়া যায়।

খোলা গেট দিয়ে থানার চত্বর এবং চত্বরের পরেই প্রাচীন পাকা বাড়ি দেখা যায়। সেখানে সারি সারি তিনটি ঘরে আলো জ্বলছে।

সীমা ভেজা গায়ে ছুটতে ছুটতে, গেটের ভিতর দিয়ে, থানার মধ্যে প্রবেশ করল।

সামনের ঘরেই থানার ও. সি. বসে এস. আই-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। দরজায় সশস্ত্র কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

কনস্টেবল কোন রকম বাধা দেবার আগেই সীমা ভিতরে ঢুকে, ও. সি-র টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াল। ও. সি. এবং এস. আই. দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সীমা হাঁপাচ্ছে। তার গা থেকে জল এবং ঘাম ঝরছে। ও চিৎকার করে উঠল, 'আমি খুন করে এসেছি দারোগা বাবু, আমি খুনী।' সীমার মুখে জামা কাপড়ে রক্তের দাগ।

ও. সি. লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খুন! কাকে খুন করেছ?'

সীমাঃ 'দিলদারপুরের মস্ত বড়লোক মহাজন, আড়তদার কালীচরণ সরকারকে।' বলতে বলতেই ও টেবিলটা আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সহসা অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কনস্টেবল দরজার কাছ থেকে ছুটে এলো।

ও. সি. চিৎকার করে বললেন, 'কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়েটা কে?'

এস. আই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'স্যার, কিছু ভাববেন না। বাইরে লোকজনের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তাদের মুখ থেকেই সব শোনা যাবে। এখন মেয়েটাকে দেখা যাক।'

বাইরে থানার গেটের সামনে বহু কণ্ঠের কোলাহল তখন উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

সীমার স্বীকারোক্তি থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল, কালীচরণকে হত্যা কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। প্রথম যাত্রার দিনই, ও যে কালীচরণের নৌকায় আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে এসেছিল, তা ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটা আমার বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

কালীচরণকে হত্যার পূর্বমুহূর্তে, সীমার স্বগতোক্তি থেকেই আপনারা বুঝে নিয়েছিলেন, ও ওর জীবনের অতীতের ঘটনাবলী বলতে বলতে, কালীচরণকে হত্যার সুযোগই খুঁজছিল। অন্যথায় কালীচরণ যখন তার লালসার হাত সীমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সীমা নিজেকে গুটিয়ে নিত। কিন্তু সীমা তা নেয় নি। বরং শঙ্কর আর শম্ভুকে অবাক করে দিয়ে, কালীচরণের কাছেই যেন ও নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিল।

আপনারা মনে মনে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। হয়তো কিঞ্চিত খটকাও লেগেছিল, কালীচরণের প্রতি সীমার আচরণে। মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ ওর অতীত জীবন কাহিনী থেকেই জানা গিয়েছিল, ও স্বৈরিণী বা কুলটা নয়। বরং ও ওর নারীত্বকে রক্ষা করার জন্য এতকাল প্রাণপণ লড়াই করে এসেছে।

এখন আর আপনাদের মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়, যাত্রার প্রথম থেকেই সীমার কালীচরণের নৌকায় ওঠা, একটি পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনার সূচনা মাত্র। যার পরিণতি এই কালীচরণ হত্যা। কিন্তু কেন এই হত্যা? নৌকায় কালীচরণের সীমার প্রতি আচরণ?

জবাবটা আমি দেব না। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই সীমার বিচারসভায়।

বিচারক তাঁর আসনে আসীন। স্টেনো এবং পেশ্‌কার তাঁর অদূরে নিজেদের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর নিজের জায়গায় বসে। পাশেই মণিমহেশপুর থানার ও. সি. এবং এস. আই।

কালীচরণের পক্ষের উকিল একপাশের চেয়ারে বসে। তাঁর পিছনেই বসে আছে শঙ্কর আর শম্ভু। ওদের দৃষ্টি আসামীর কাঠগড়ার দিকে। কোর্টঘর জনপূর্ণ। তাদের মধ্যে কালীচরণের দাঁড়ি, মাঝি, সাঁইদার এবং এমন কি একপাশে হাবাও দাঁড়িয়ে আছে।

হাবা হাঁ করে, বড় বড় চোখে আসামীর কাঠগড়ার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সকলের দৃষ্টিই আসামীর কাঠগড়ার দিকে। এমন কি কোর্টরুমের দরজার পাহারাদারেরও। কোর্টরুমে একটা গুঞ্জন চলছেই।

বিচারক দু-একটি কাগজ-পত্র দেখলেন। একবার মুখ তুলে সামনে তাকালেন, 'আস্তে, সাইলেন্ট প্লীজ!' ফিরে তাকালেন একবার পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে। তারপরে মৃত কালীচরণের উকিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট যা গঠন করার, তা হয়ে গেছে। এখন এই চার্জশীটের পক্ষে এবং বিপক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য, যুক্তি প্রমাণ ইত্যাদির কাজ এখন শুরু হচ্ছে।'

শঙ্কর আর শম্ভুর উকিল উঠে দাঁড়ায়, 'ইওর অনার, আমি শুধু আপনাকে একটি কথাই বলতে চাই। এখানে পক্ষ আছে, বিপক্ষ বলে কিছু নেই।'

বিচারক আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকান। আসামীর কাঠগড়ায় সীমাকে দেখা যায়। আণ্ডার-ট্রায়াল জেলখানা থেকে যদিও তাকে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন অতি সাধারণ একটি শাড়ি জামা পরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু তার খোলা চুল জট পাকানো, মুখ শীর্ণ, চোখের কোল বসা, অথচ চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

বিচারক মুখ টিপে হাসেন: 'এটা একটা খুনের মামলা। আপনি বিচক্ষণ আইনজীবি, নিহত কালীচরণ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আপনি কি করে বলছেন, একটি খুনের মামলায় পক্ষ আছে বিপক্ষ বলে কিছু নেই?'

কোর্টরুমে গুঞ্জন, কিছুটা চাপা হাসাহাসি।

শঙ্করের উকিলকে একটু বিব্রত দেখায়: 'ইওর অনার, আমি ঠিক তা বলতে চাই নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, আসামী পক্ষ থেকে কোন উকিলই দাঁড় করানো হয় নি।'

বিচারক: 'ঠিক, কিন্তু বিপক্ষের অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'

উকিল: 'আমি তা কখনোই পারি না ইওর অনার, আমার বলতে একটু ভুল হয়েছে। আমার বক্তব্য, এই যে দুর্দান্ত প্রকৃতির

খুনী মেয়ে—' আঙুল দিয়ে সীমাকে দেখায়। সীমা কোন দিকে তাকায় না, বিচারকের দিকে ওর দৃষ্টি। উকিল বলে চলেন, 'এই খুনী মেয়ে—যার নাম সীমা ভুঁইহার, কালীচরণ সরকারকে নিজের হাতে খুন করে, মণিমহেশপুর থানায় নিজেই অফিসারদের কাছে তার স্বীকারোক্তি দিয়েছে।'

ও. সি. উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হন।

বিচারক হাত তুলে: 'আপনি বসুন, থানার নথিপত্র, স্বীকারোক্তি আমি সবই দেখেছি।' উকিলের দিকে তাকিয়ে: 'হ্যাঁ, তারপর বলুন।'

উকিল: 'থানার স্বীকারোক্তি ছাড়াও ইওর অনার, প্রাথমিক শুনানী এবং সাক্ষীদের জেরার সময়ে, আসামী আপনার সামনেও স্বীকার করেছে, সে কালীচরণ সরকারকে নিজের হাতে ছুরি মেরে হত্যা করেছে।'

বিচারক: 'তা নথিভুক্ত হয়েছে।'

উকিল: 'অতএব, আমার বক্তব্য, এখন এই চার্জশীট গঠনের পরে আর নতুন করে কি সওয়াল জবাবের কোন দরকার আছে? ইওর অনার, আমি পাবলিক প্রাসকিউটরের কথা আর একবার এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন, আসামী পৃথিবীর একজন নিকৃষ্ট খুনী মেয়ে, আইনের হাতে তার চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত।...তাছাড়া আসামী পক্ষে সওয়াল করার জন্য যখন কোন উকিল নেই, তখন নতুন করে আর প্রসিড করার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ইওর অনার, এখন আমরা আপনার সুবিচার প্রার্থনা করছি।'

কোর্টরুমে গুঞ্জন।

শম্ভু: 'হারামজাদীকে ফাঁসী দিতে হবে।'

শঙ্কর ক্রুদ্ধ চোখে সীমার দিকে তাকায়।

বিচারক হাতুড়ি পেটান: 'সাইলেন্ট, সাইলেন্ট!'

কোর্টরুম নীরব। বিচারক সীমার দিকে তাকান। কিন্তু সীমার চোখের দিকে যেন তাকিয়ে থাকা যায় না। তিনি বলেন, 'কিন্তু

একটা কথা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আসামীকে আমি যখন এই কোর্টে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে দোষী কি নির্দোষী, সে নিজেকে নির্দোষী বলেছে।'

উকিল : 'অথচ সে নিজেকে খুনী বলে স্বীকার করেছে, আইনের সেটাই শেষ কথা।'

বিচারক : 'আইনের সেটাই শেষ কথা, আবার শেষ কথা নয়ও। সীমা ভুঁইহারকে সেইজন্য আমি নিজে সওয়াল করতে চাই।'

সীমার দু'চোখে হঠাৎ যেন জল আসে, ও মুখ নামায়।

কোর্টরুমে আবার গুঞ্জন জোরালো হয়।

বিচারক সীমার দিকে তাকান : 'তোমার নাম সীমা ভুঁইহার?'

সীমা ঘাড় ঝাঁকায়।

বিচারক গম্ভীর ও শক্ত মুখে বলেন, 'এখানে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কোন কথা হয় না। যা বলবার তা মুখে বলবে।'

সীমা (ভাঙা ভাঙা স্বরে) : 'হ্যাঁ, আমার নাম সীমা ভুঁইহার।'

বিচারক পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকান : 'ভুঁইহার কি বাঙালী হয়?'

পাবলিক প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়ান : 'না ইওর অনার, ভুঁইহাররা প্রধানতঃ বিহার প্রদেশের অধিবাসী। প্রায় অধিকাংশই সম্পন্ন হিন্দু।'

বিচারক : 'ধন্যবাদ, বসুন।' সীমার দিকে তাকান : সীমা ভুঁইহার, এখানে যাঁরা আছেন, তুমি তাঁদের কাকে কাকে চেনো?'

সীমা কোর্টরুমের দিকে তাকায়, তারপরে বিচারকের দিকে তাকিয়ে : 'হুজুর, কালীচরণ সরকারের মাঝি মাল্লাদের সকলেরই আমি মুখ চিনি। তার ছোট ছেলে শম্ভুকে চিনি। সব থেকে ভালো করে চিনি তার বড় ছেলেকে।'

শঙ্কর বিব্রত, অস্বস্তি বোধ করে। সকলের দৃষ্টি তার ওপর।

বিচারক : 'বড় ছেলে? তার নাম কি?'

সীমা : 'হুজুর, আমি ওর নাম মুখে নিতে পারি না।'

কোর্টরুমে বিস্ময়।

বিস্ময় বিচারকের চোখে মুখেও : 'কেন, ওর নাম মুখে নিতে পারো না কেন ?'

সীমা : 'হুজুর, মেয়েরা যাকে একবার স্বামী বলে বরণ করে, তার নাম নিতে পারে না।' সীমা শঙ্করের দিকে তাকায়, চোখে জল।

কোর্টরুমে বিস্মিত গুঞ্জন। শঙ্করের মুখ নীচু।

উকিল উঠে দাঁড়ায় : 'ইওর অনার, এ সব কাল্পনিক গল্প করার জায়গা কোর্ট নয়। আমার ক্লায়েন্ট শঙ্কর সরকারের সঙ্গে এই খুনী মেয়ের কোন কালেই পরিচয় ছিল না।'

বিচারক : 'শঙ্করবাবু, আপনিও কি তাই বলছেন ?'

শঙ্কর প্রথমে ওঠে না, পরে একটু দ্বিধা করে উঠে দাঁড়ায় : 'না, আমি যখন দিলদারপুর থেকে সিরাজনগরের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়তে যেতাম, তখন থেকেই ওকে চিনতাম। তারপরে যখন সিরাজনগরের ওপারে নবহাট কলেজে পড়তে যেতাম, তখনও ওর সঙ্গে আমার দেখা হত। কিন্তু আমার বাবাকে খুন করার সঙ্গে সে-সবের কোন যোগাযোগ ছিল না।'

কোর্টরুমে রীতিমত সোরগোল।

বিচারক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এটা থিয়েটার হল নয়, চুপ করুন সবাই।' তিনি সীমার দিকে তাকান : 'তোমার কি বক্তব্য সীমা ভুঁইহার ?'

সীমা : 'হুজুর, ও মিথ্যে কথা বলে নি। ওর বাবাকে খুন করার সঙ্গে ওর আমার সম্পর্কের কোন যোগাযোগ ছিল না। তখন আমি জানতামও না ও কালীচরণ সরকারের ছেলে। তাহলে আমি কখনই ওকে ভালোবাসতে পারতাম না...' সীমা শঙ্করের দিকে তাকায়। শঙ্করও তাকায়, তার দৃষ্টিতে ঘৃণা।

উকিল (শঙ্করকে) : 'আপনি বসুন।'

শঙ্কর বসে।

সীমা শঙ্করের দিক থেকে মুখ ফেরায় না, চোখে জল : 'হুজুর, তখন মামা মামীর কাছে বড় দুঃখে ছিলাম ওর ভালোবাসাই আমাকে

রক্ষা করে ছিল—আর—আর—(ভাঙা ভাঙা স্বরে) ও-ও বোধহয় আমাকে ভালোবেসেছিল। আমাকে বিয়ে করতে—।' কান্নায় ভেঙে পড়ে সীমা, দু'হাতে মুখ ঢাকে।

কোর্ট রুম স্তব্ধ। কেউ সীমাকে দেখে, কেউ শঙ্করকে।

উকিল এই স্তব্ধতার মধ্যে উঠে দাঁড়ায়ঃ 'ইওর অনার, উভয়পক্ষই যখন বলছে, কালীচরণ হত্যা মামলার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কোন যোগাযোগ নেই, তখন আর ও সব কথায় আমরা সময় নষ্ট করছি কেন?'

বিচারক (গম্ভীর মুখে): 'ঠিক কথা, ইউ আর রাইট লার্নেড কাউন্সেল!' তিনি সীমার দিকে তাকানঃ 'সীমা ভুঁইহার।'

সীমা দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বিচারকের দিকে তাকায়।

বিচারকঃ 'মণিমহেশপুর থানায়, আর এই কোর্টে, তুমি স্বীকার করেছ, দিলদারপুরের কালীচরণ সরকারকে তুমি হত্যা করেছ। তুমি এখনও কি তাই বলছ?'

সীমাঃ 'হ্যাঁ হুজুর, এখনও তাই বলছি, কালীচরণ সরকারকে আমি হত্যা করেছি।'

বিচারকঃ 'তাহলে তোমার নির্দোষিতা প্রমাণের আর কোন সুযোগ থাকছে না।'

শঙ্করের উকিল হেসে বসে পড়ে। শম্ভু ক্রুদ্ধ চোখে শঙ্কর আর সীমাকে দেখে।

বিচারক সীমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমার আর কিছু বলবার আছে?'

সীমাঃ 'আছে হুজুর। আমি কেন নিজেকে নির্দোষ বলেছি, আপনি যদি দয়া করে শোনেন, আমি সেই ঘটনা বলতে চাই।'

কোর্টে আবার চাঞ্চল্য। বিচারক ঘড়ি দেখেন। বলেন, 'বেশ, অল্প সময়ে সংক্ষেপে যা বলবার আছে তা বল।'

সীমাঃ 'হুজুর, আমার বাবার নাম লোচনদাস ভুঁইহার। তিনি বিহার থেকে মণিমহেশপুরে এসেছিলেন। আমার মা ছিলেন ভিন্ন

জাতের মেয়ে, তাই আমার বাবাকে সংসার ছেড়ে আসতে হয়েছিল।··· আমার মাকে, আমার দিদিকে আর আমাকে ছ' বছরের সময় নিয়ে বাবা মণিমহেশপুরে গেছলেন ব্যবসা করতে।

মণিমহেশপুরে বাবাকে সবাই চেনে।···

আমার বাবার টাকা ছিল, কিন্তু মণিমহেশপুরে একজন বিশ্বাসী চেনা লোকের দরকার ছিল।···সেই চেনা বিশ্বাসী লোকটি জুটেছিল দিলদারপুরের কালীচরণ সরকার। আমার বাবা তাকে ব্যবসায় সমান অংশীদার করে নিয়েছিলেন।'

শঙ্করের উকিল উঠে দাঁড়ায়ঃ 'ইওর অনার! এই সব সাক্ষ্য প্রমাণহীন কাহিনী কি আমাদের শুনতে হবে?'

বিচারক ঃ 'আপনি দয়া করে বসুন।' (সীমাকে) 'বল।'

সীমা ঃ 'আমি যা বলছি, মণিমহেশপুরের সবাই তা জানেন। কালীচরণ সরকারকে নিয়ে আমার বাবার ব্যবসা বেশ বড় হয়ে উঠেছিল।···জোত জমি, গঞ্জের আড়তদারি, চালানি ব্যবসা···আমাদের সুখের সংসার···কিন্তু মা হঠাৎ মারা গেলেন। বাবার মনটা ভেঙে গেছল, আমাদের দুই বোনকে দিয়ে মায়ের শোক ভুলতে চেয়েছিলেন। তখন আমার দিদির বিয়ের বয়স হয়েছে, সে-ই সংসার দেখত। আর বাবা···আমার বাবা···! সীমার চোখে জল, সব ঝাপসা হয়ে যায় চোখের সামনে।'

কথিত কাহিনীর বর্ণনা থেকে, ঘটনাস্থলে যাওয়াই ভালো, কী বলেন? সীমা ওর জবানীতে যে কাহিনী বিবৃত করতে চলেছে, চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই সেই মণিমহেশপুর গঞ্জে। ঘটনাবলী চাক্ষুষ করা যাক। চরিত্রগুলোকে চিনতে ও বুঝতে সুবিধে হবে। এবার একেবারে ঘটনার শুরু ও সূত্রপাতে যাওয়া যাক।

মণিমহেশপুরের গঞ্জে বিশাল আড়তের সামনে সাজানো গদী।

গদীর ওপরে লোচনদাস ভুঁইহার আর কালীচরণ আসীন।

হিসেব রক্ষক কর্মচারীরা কাজে ব্যস্ত। কালীচরণ খাতা দেখছে। লোচন টাকার নোট গুণছে। কালী আড়চোখে লোচনদাসের টাকা গোণা দেখছে।

কালী : 'লোচন, আমার মতে দুটো খুটনি নৌকো মাল বোঝাই করে একসঙ্গে চালান দেওয়াই ভালো।'

লোচন : 'খুটনি নৌকো তো হাতের কাছে এখন একটাই আছে। আজ বিকেলে আর একটা মাল খালাস করে এসে পৌঁছুবে। কিন্তু কালী, মাঝিদের তো ভাই দুটো রাত বিশ্রাম দিতে হবে।'

কালী : 'তা দাও না, ক্ষতি কী? আমি বলছিলাম কি, দুই খুটনি নৌকো বোঝাই মাল এক জায়গাতেই যাবে। কাল একটা যাবে, আবার পরশু আলাদা একটা যাবে, তার দরকার কি? তোমাকে বা আমাকে দুজনের মধ্যে একজনকে তো নৌকোয় থাকতেই হবে। তার চেয়ে পরশুই দুটো নৌকো একসঙ্গে যাবে, মাঝিদেরও দু' রাত বিশ্রাম হয়ে যাবে।'

লোচন (হাতে নোটের গোছা) : 'চালানী নৌকোর সঙ্গে তো তুমিই যাও, আমি আর কতটুকু যাই। তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর।' নোটগুলো কালীচরণকে দিয়ে বলে, 'এই টাকাগুলো ধর। ক্যাশে বোস তো, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।'

কালী : 'ধুর বাপু, আমি অত টাকা পয়সার হিসেব পত্তর করতে পারি না। এই খাজাঞ্চি বাবুকে দাও না। আমি ধান চালের হিসাবই রাখতে পারি।'

লোচনদাস হাসে। খাজাঞ্চি এবং কর্মচারীরাও হাসে।

লোচন : 'শোন গো তোমরা, তোমাদের কালীবাবু নাকি টাকার হিসেব করতে পারে না।'

কেউ কেউ সশব্দে হেসে ওঠে। কালীচরণ বিরক্ত চোখে সবাইকে দেখে। আড় চোখে নোটের গোছার দিকে তাকায়।

লোচন : 'নিন খাজাঞ্চিবাবু, ক্যাশে এসে বসুন, আমি এখুনি একটু আসছি।'

খাজাঞ্চিবাবু ক্যাশে এসে বসেন।

গঞ্জের গাছতলায় মাদুরের ওপর মোটা শতরঞ্জি পাতা। সময় আসন্ন সন্ধ্যা।

শতরঞ্জির ওপর কয়েকজন বসে। তাদের কারোর হাতে সোনার তাগা, প্রত্যেকের হাতে ঘড়ি। জামা কাপড়ে গ্রামীন সম্পন্নতার ছাপ, নিতান্ত গরীব চাষা ভূষো কেউ না। কালীচরণও ওদের মধ্যে রয়েছে। সকলের সামনেই দেশী মদ ভর্তি গেলাস।

একজন : 'এই রে, ওহে কালা, তোমার বিধবা পার্টনার লোচনদাস এদিকে আসছে।'

কালীচরণ মুখ তুলে তাকায়। লোচনদাস এগিয়ে আসছে।

কালী : 'এলে কি করব? সারাদিন কাজকর্মের পর মাল খাই, সে কথা লোচন জানে! ও না খেলে আমি কি করব?'

২য় : 'কালা, লোচনদাসকে তুমি মাল খাওয়াটা ধরাতে পারলে না?'

কালী : 'না ভাই। আর খাওয়াব কি, ও শালা খালি নিজের মরা বউয়ের শোক করে!'

সবাই হাসে। লোচন সামনে এসে দাঁড়ায় : 'ঠিক জানি, কালী এখানেই আছে।'

সকলেই নড়েচড়ে বসে।

৩য় : 'আসুন লোচনদাস বাবু, বসুন।'

লোচন : 'না ভাই, বসব না, আপনারা বসুন। আমি কালীকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

২য় : 'আহা, আমরা না হয় আপনার মতন বড় আড়তদার চালানদার নই, তা বলে বসতে কি আছে?'

লোচন : 'ছি ছি নস্কর মশাই, এ কি বলছেন? আপনারাও কারবারি, আমিও কারবারি, বড় ছোটর কথা আসছে কেন? আর আমি বসেই বা কি করব বলুন, আপনাদের এ রসে আমি বঞ্চিত। তা ছাড়া সন্ধ্যে হয়ে গেল, মেয়ে দুটো বাড়িতে রয়েছে। কই হে কালী, নেশা তো বেশ করেছ, আর কেন?'

কালী : 'কোথায় বেশ নেশা দেখলে? পুরো এক বোতলও এখন খাই নি।'

লোচন : 'কেন যে খাও। ওই খেয়েই বউটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললে।'

কালী : 'তার মানে? তুমি কি আমাকে জেল খাটাতে চাও নাকি?'

লোচন : 'ছি ছি, কী যে বল। লোকে যা বলে, আমিও তাই বললাম। তা বলে কি সত্যি নাকি?' লোচন সকলের দিকে তাকায়, হাসে।

১ম : 'কালীকে এখন আর কে ধরবে? কালী এখন বড়লোক মানুষ, বাদায় বিস্তর জমি।'

৪র্থ : 'হ্যাঁ, কালীর আর সেদিন নেই যে, পেটে ভাত নেই, পরের ব্যবসায় খেটে মরছে। লোচনবাবু না ডেকে নিলে—'

কালী (ক্ষিপ্তপ্রায়) : 'হঠাৎ আমার পেছনে সবাই লাগছ কেন বল তো? কী—কী বলতে চাও তোমরা?'

লোচন : 'আরে ও সব বন্ধু বান্ধবের কথা ধরতে নেই। তুমি একবারটি উঠে এসো কালী, আমি একটা কথা বলেই চলে যাব।

কালী উঠে দাঁড়ায়, টলে। লোচন কালী একটু দূরে আলাদা সরে যায়।

লোচন : 'শোন কালী, গভর্ণমেন্টের এজেন্টবাবু এসেছিল। এখনো এক হাজার মন ধান আমাদের দিতে বলছে।'

কালী : 'কেন, আমাদের যা দেবার, তা তো দিয়ে দিয়েছি, আবার কেন ?'

লোচন : 'ওরা খবর পেয়েছে. আমাদের এখনো মাল আছে। আমি বাপু ও সব মিথ্যে কথা ছিচ কেমিতে যেতে পারব না। দিয়ে দেব ভেবেছি।'

কালী : 'আমার অংশ থেকে দেব না, তাহলে রাতারাতি মাল সরিয়ে ফেলব।'

লোচন (হেসে) : 'আমার অংশ থেকেই দেব। খবরটা তোমাকে জানিয়ে গেলাম। তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলে, তুমি যেন আবার উল্টোপাল্টা কিছু বোলো না। আমি চলি। তুমি আর দেরি কোরো না, চলে যেও।' বলে হনহন করে চলে যায়।

কালী (চিবিয়ে) : 'বেশী সাচ্চাগিরি!' সে আরো ক্রুদ্ধ মুখে আসরের সামনে ফিরে যায়। ৪র্থ ব্যক্তিকে বলে 'এই দ্যাখ অমর্ত, তুমি আমার বিষয়ে যদি আজে বাজে কথা বল তোমার দাঁত ভেঙে ফেলে দেব।'

৪র্থ ব্যক্তি অমর্তও হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে : 'আজে বাজে কথা মানে ? আমি কি মিছে কথা বলেছি ? সাত বছর আগে তো তুমি আমার কাছেই কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি করতে। আর এখন বলছ দাঁত ভেঙে দেব ?'

সবাই হৈ হৈ করে ওঠে।

১ম : 'আরে নিজেদের মধ্যে—ছি—ছি—ছি ··'

২য় : 'মালের মুখের কথা···'

৩য় (কালীচরণকে ধরে বসায়) : 'আরে বসো, বসো। অমর্তের যেমন কথা। কালী কি আর সেই কালী আছে।'

১ম : 'কিন্তু যা-ই বল, লোচনদাস লোক মোটেই সুবিধের নয়, ভারি অহংকারি।'

২য়ঃ 'এই কালীচরণ না থাকলে কি লোচনদাস এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলতে পারত?'

অমর্ত: 'ওটা আমি মানি না। কালীকে আমার জানা আছে, কেমন কাজের লোক। চোখে চোখে না রাখলেই চুরি—'

৩য় বাধা দিয়ে বলে, 'এই অমর্ত, কেন পুরনো কথা টেনে আনছ বল তো?'

কালী: 'আনতে দাও, আনতে দাও। আমার সুদিন ওর আঁতে লেগেছে, ও চায় আমি এখনো ওর কুড়ি টাকা মাইনের গোলাম হয়ে থাকব।' বোতল তুলে চুমুক দেয়, হাসে।

সবাই হাসে।

লোচনদাস বাড়ির দালানে ঢুকে বাড়ির ভেতরে শাঁখ বাজার আওয়াজে কপালে হাত ঠেকায়।

সুদীর্ঘ দালানের দুই প্রান্তে দুটি হ্যারিকেন জ্বলছে। সারি সারি ঘর।

একটি ঘর থেকে তেরো বছরের সীমা বেরিয়ে আসে—ফ্রক পরা।

সীমা: 'বাবা, তুমি এসেছ? এইমাত্র তোমার কথা বলতে বলতে দিদি ঠাকুরকে সন্ধ্যে দেখাতে গেল।'

লোচন (কন্যার কাঁধে হাত রেখে): 'তাই বুঝি? তোরা আর আমার কথা কি ভাববি, আমিই তোদের কথা ভাবব।' গায়ের জামা খুলতে খুলতে: 'তুই কি পড়ছিলি?'

সীমা লোচনের হাত থেকে জামাটা নেয়: 'দাও, আমি জামাটা তোমার ঘরে রেখে আসি। তুমি ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে এসো।' সে চলে যায়।

লোচন স্নেহস্নিগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকায়। দালানের পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রদীপ আর ধূপকাঠি হাতে রমা এগিয়ে আসে। সে অষ্টাদশী। লোচন রমার দিকে তাকায়।

রমা কাছে আসে: 'তুমি এসে গেছ বাবা। সন্ধ্যে উৎরে যাচ্ছে দেখে ভাবনা হচ্ছিল।'

লোচন: 'আমার জন্যে ভেবে ভেবেই তোরা গেলি।'

রমা: 'তার জন্যে নয় বাবা, তুমি যে বলে গেলে কালীকাকার কাছে যাচ্ছ। এ সময়ে কালীকাকার কাছে যাওয়া—শুনলেই আমার ভয় লাগে।' বলে রমা হাসে: 'তা তুমি যে জন্যে গেলে, তার কী হল?'

লোচন: 'না, কালী ওর অংশ থেকে গভর্ণমেণ্টকে আর চাল দেবে না। সরকারের দাম কম—আমাকে একলাই হাজার মন ধান দিতে হবে।'

রমা: 'আমি তো তোমাকে এ কথা আগেই বলেছিলাম বাবা, কালীকাকা চশমখোর—

লোচন: 'রমা, ও-কথা থাক। শত হলেও সে আমার ব্যবসার অংশীদার। তুই মা আমার পুজোর জায়গাটা করে দে।'

রমা: 'তাই তো যাচ্ছিলাম বাবা।' দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার থামে: 'বাবা, তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে কিন্তু আমি কথাটা বলি নি।'

লোচন: 'জানি মা, তবে সংসারে সব কিছুর সঙ্গেই মানিয়ে চলতে হবে।'

লোচনের শোবার ঘরের দেওয়ালে তার স্ত্রীর ছবির পাশে রমা ধূপদানীতে ধূপকাঠি রাখে, প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে, মুখ তোলে।—'মা, তুমি তো জানো, আমার মনে ভয় কোথায়? বাবা যতই কালীকাকাকে বিশ্বাস করুক, আমি তো লোকটিকে চিনে নিয়েছি। বাবাকে নিয়ে বড় ভয় পাই মা।' রমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

দালানের একটি চেয়ারে বসে, লোচন গামছা দিয়ে হাত পা মোছে। পাশে সীমা দাঁড়িয়ে লোচন: 'বেশ—ইস্কুলে পাশ দিয়ে কী করবি?'

সীমা: 'কলেজে পড়ব।'

লোচন: 'ও বাবা! তোর দিদির বিয়ে হয়ে যাবে। তুই যাবি কলেজে পড়তে, আমি তাহলে কাকে নিয়ে থাকব?'

সীমা (আবদারের স্বরে): 'তিন বছর তো। তিন বছর কলেজে পড়েই আবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। তা ছাড়া ছুটি-ছাটা তো আছেই!'

রমা এগিয়ে আসে: 'কী বলছিস?'

লোচন: 'তোর বোন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়তে যাবে, হোস্টেলে থাকবে।'

রমা হাসে: 'ও সব কিছু হবে না, বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে।' বলেই চলে যায়।

সীমা: 'ইস্। তোমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে!'

রমা জিভ ভেংচে দেয়।

লোচন উঠে পূবদিকে পূজোর ঘরে যেতে যেতে বলে: 'আচ্ছা, আগে ইস্কুলের পাশটা দে, তারপরে দেখা যাবে।'

রমা সীমা খাটের ওপর বিছানায় বসে পড়ছে।

লোচন পূজোর ঘরে আসনে চোখ বুজে বসে জপ করছে।

বাড়ির অন্ধকার উঠোনে মত্ত কালাচরণ এসে প্রবেশ করে, আলোকিত দালান ও ঘরের দিকে তাকায়। এগিয়ে যায়।

কালাচরণ দালানে এসে ঢোকে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে রমা আর সীমাকে চোখে পড়ে। তার বিশেষ লোলুপ দৃষ্টি রমার প্রতিই।

সে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারপর খাটের ধারে গিয়ে আচমকা রমার গাল টিপে দেয়, 'কি গো রমা, এত কি পড়াশুনো হচ্ছে?'

রমা তড়াক করে খাট থেকে নেমে সরে যায়ঃ 'এ কি কালীকাকা, একেবারে সাড়া না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছ?'

কালী হাসেঃ 'কেন রে, আসতে পারি না?' একবার মুখ ফিরিয়ে ভীতত্রস্ত সীমাকে দেখেঃ 'তা তোমাদের বাবা কোথায়? একটা জরুরি কথা বলতে এলাম।'

রমাঃ 'চল, দালানের চেয়ারে বসবে। বাবা পূজোয় বসেছে, আমি খবর দিচ্ছি।'

কালী তথাপি একবার লুব্ধ চোখে রমার সর্বাঙ্গ লেহন করে, হেসে দরজার দিকে এগিয়ে যায়ঃ 'তোরা বোস, আমিই তোর বাবাকে ডাকছি।'

রমা আর সীমা ভীত দৃষ্টি বিনিময় করে।

সীমা (চুপি চুপি)ঃ 'মদ খেয়ে এসেছে!'

দালানে কালীচরণঃ 'কই হে লোচন, পূজোপাট শেষ হল?'

দালানের পূর্বপ্রান্তে লোচনকে আসতে দেখা যায়ঃ 'তুমি এখন আবার কি মনে করে?' সে এগিয়ে আসে।

কালীঃ 'বলতে এলাম ঐ হাজার মন চালের কথা। তোমাকে কথাটা বলার পর থেকে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছিল। ওটার আধাআধি বখরা আমিও দেব, বুঝলে?'

ঘরের মধ্যে রমার চোখে অবাক ভ্রূকুটি।

লোচন (হেসে)ঃ 'খুব ভালো কথা ভাই। তা এ অবস্থায় কষ্ট করে এখন এখানে না এসে, কাল সকালে গদীতে বললেই তো পারতে। বস বস।'

রমার মুখে দ্বিধার হাসি। বেরিয়ে আসেঃ 'বস কালীকাকা, মালপোয়া আছে, খেয়ে যাও।'

কালী (মুখ বিকৃতি)ঃ 'মালপোয়া! না না, আমার মুখে এখন মালপোয়া ভালো লাগবে না।' রমার দিকে তাকিয়ে রীতিমত

চোখের ইশারা করে হাসে: 'চলি হে লোচন।' সে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিশে যায়।

লোচন রমাকে বলে, 'কি রে, দেখলি তো?'

'দেখলাম বাবা।' রমা জবাব দেয়।

লোচন যেতে যেতে বলে, 'সংসারে মানুষের থেকে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

রমা বাবার পিছন দিকে তাকায়, তারপর কিছুটা আপন মনেই বলে, 'সে কথা খুবই সত্যি, এই কালীকাকাকে দেখেই তো বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে যে আমি কিছুতেই মন থেকে বিশ্বাস করতে পারি না বাবা।'

'কালীকাকাকে আমার একটুও ভালো লাগে না।' দরজায় দাঁড়িয়ে সীমা বলে।

'লোকটা আগে এ রকম ছিল না, আস্তে আস্তে কেমন হয়ে যাচ্ছে।' (সীমাকে) 'সীমু, যা, তুই পড়তে যা, আমি রান্নার ব্যবস্থা দেখি।' বলে রমা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

গঞ্জের ভেড়ি বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে কালীচরণ। নদীর ধারে ছোট বড় অনেক নৌকা। দুটি খুটনি নৌকায় হৈ হৈ করে মাল বোঝাই হচ্ছে।

কালী (তার পাশের একজন কর্মচারীকে): 'মাল সব তোলা হয়েছে তো?'

কর্মচারি হিসাবের খাতা দেখে: 'আজ্ঞে হ্যাঁ সরকার মশাই।'

কালী: 'যাও, তুমি গিয়ে লোচন বাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

দূরে লোচন দাসের কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ 'পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি। হিসেব সব ঠিক আছে। এবার তুমি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।' পকেট থেকে একগোছা টাকা বের করেঃ 'খরচার টাকাটা রাখ।'

কালী টাকা নিয়ে কোমরের কষিতে গোঁজে।

লোচন (হেসে) ঃ 'গুণে নিলে না, কত টাকা দিলাম।'

কালী ঃ 'তুমি দিয়েছ, আমি আবার গুণব কেন ?'

সে নদীর ধারে এগিয়ে যায়।

লোচন ঃ 'শিবগঞ্জে মাল খালাস করে, তাহলে তুমি চারদিন বাদে ফিরছ ?'

কালী খুটনি নৌকার গায়ে ঠেকানো পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাত নাড়েঃ 'হ্যাঁ, চারদিন বাদে। তবে দু-একদিন দেরী হলে ভেবো না।'

মাঝিরা পাটা তুলে নেয়। একদল দুই নৌকার নোঙর তোলে।

লোচন ঃ 'ভালো ভাবে থেকো। তুমি এলে পরে সরকারী প্রকিওরমেন্ট অফিসারকে হাজার মন ধান দেব।'

কালী নৌকা থেকে হাত নাড়েঃ 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

লোচন দাঁড়িয়ে দুটি বড় বড় খুটনি নৌকা চলতে দেখে। তার ঠোঁট নড়ে, কপালে দু'হাত ছোঁয়ায়।

দুটি খুটনি নৌকা পাশাপাশি মাঝনদীতে। কালী দোতলায় ছই মাচার ওপরে হালের কাছে বসা। হালমাঝি তার পাশে। হাল মাঝিটির কালো চোয়াড়ে চেহারা ; তার ছোট চোখ দুটি হিংস্র।

কালী (নীচু স্বরে) ঃ 'ব্যবস্থা সব ঠিক করা আছে তো ?'

মাঝি ঃ 'সব ঠিক আছে।'

কেউ কারোর দিকে তাকায় না, কিন্তু কথা চালিয়ে যায়।

কালী : 'কোথায়, কবে ?'

মাঝি : 'আজ রাতেই, দুধপোয়ালীর চরে।'

কালী : 'দুধপোয়ালির চরে রাতে নোঙর করবে? নৌকোর মাঝিরা সন্দেহ করবে না ?'

মাঝি (বীভৎস হাসে) : আমার নাম করালী মাঝি, বুঝলে কালাদা। হিসেব করে দেখেছি, দুধপোয়ালির চরে গেলে, বিকেলের গোনের জোয়ারে, সন্ধ্যে রাতে ভাঁটা পড়ে যাবে। মাঝিদের ওখানেই নোঙর করে রান্না খাওয়া করতে হবে।'

কালী : 'আর তারা ?'

মাঝি : 'কাছেপিঠেই তারা আঠারোটা নৌকা নিয়ে থাকবে, কাজকর্ম সেরে ভাঁটার টানে বেরিয়ে যাবে।'

কালী লোকটার মুখের দিকে তাকায়। দুজনেই হাসে।

কালী : 'সকলের আগে আমার হাত পা বেঁধে ফেলো।'

মাঝি : 'সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি নিজেই তোমাকে এমন ভাবে বেঁধে ফেলে রাখব, মাঝিরা ভাববে ডাকাতদেরই কীর্তি।'

কালী : 'দেখো, আমার বখরাটা যেন ঠিক থাকে।'

মাঝি : 'কি যে বল তুমি কালাদা, আজ তক্ কখনও তা হয়েছে।'

কালী : 'না, তা হয় নি, তবু ওই কথার কথা আর কি।'

লোচনদাস আড়তে, কর্মচারির প্রতি : 'আড়তের জমা ধান থেকে আমার আর কালীবাবুর সমান অংশে, হাজার মন ধান আলাদা করে রাখবে, ওটা গভর্ণমেণ্ট কিনবে।'

কর্মচারি : 'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

লোচনদাস কর্মচারিদের নির্দেশ দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

দালানে লোচন বসা। উঠোনে একটি ঝি কাজ করছে। পিছনের বাগানে গোয়াল পরিষ্কার করছে একটি লোক। বাড়ির পিছনে একটি পুকুর।

রমা দালানে আসে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে: 'রওনা করিয়ে দিয়ে এলে বাবা?'

লোচন (চায়ের কাপ নিয়ে): 'হ্যাঁ মা, দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করিয়ে দিয়েছি। সীমু বুঝি ইস্কুলে গেছে?'

রমা: 'হ্যাঁ।' রমা অন্যমনস্ক, চিন্তিত।

লোচন কন্যার দিকে তাকিয়ে: 'কি রে রমু, কি ভাবছিস?'

রমা: 'বাবা, আজকাল বড় রকমের মাল চালান দিলেই কেমন যেন ভয় হয়।'

লোচন: 'কেন রে?'

রমা: 'ভেবে ছাখ, চোদ্দ মাসের মধ্যে আমাদের চালানী নৌকোয় দু'বার ডাকাতি হয়েছে। দেড় লাখ টাকার ওপরে ক্ষতি—'

লোচন (হাত তুলে): 'আহ্, রমু, এই মাত্তর শুভ যাত্রা করিয়ে এসেছি, এখন ও সব অলুক্ষুণে কথা বলিস না মা।'

রমা বিব্রত: 'অন্যায় হয়ে গেছে বাবা, রাগ কোরো না যেন।'

লোচন হাসে: 'রাগ করব কেন, তোর কথা শুনলে বুকের ভেতরটা যে গুর গুর করে ওঠে। আমি তো কেবল ভগবানের নাম করছি। পুলিশকেও বলা আছে।'

উঠোনের দিক থেকে একটি কণ্ঠ শোনা যায়: 'কাঁহাহো লোচনদাস বাবুজী।'

জীবনলাল, লোচনদাসের শালাকে দেখা যায় উঠোনে, সেও বিহারী।

লোচন: 'ঐ তোর মামা এসেছে ছাখ রমা। আ যাও হো জীবনলাল বাবুজী।'

জীবনলাল দালানের দরজায় পা দিতেই, রমা এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করে।

জীবনলাল রমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে।

লোচন: 'তা এ মুলুকে তো বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, এখনও কথাবার্তার কায়দা করতে পারলে না?'

জীবনলাল: 'কে বললে পারলাম না?'

সবাই হেসে ওঠে।

রমা: 'মামা, বসো। মামী আর ভাই বোনেরা কেমন আছে বল?'

জীবনলাল চেয়ারে বসে: 'তোর মামীর কথা আর বলিস না, মেজাজ তো না, ধারালো দা।'

রমা হাসে।

লোচন: 'মেয়েমানুষের একটু ধার থাকা ভালো।'

জীবন: 'তা বলে ওই রকম ধার? চোপার সামনে দাঁড়ানো যায় না। যাও না, তুমি গিয়ে শালার বৌয়ের কাছে কিছু দিন কাটিয়ে এসো না।'

লোচন: 'মাপ কর ভাই, তোমার বউকে নিয়ে তুমিই থাকো। আমার আর শালার বৌয়ের কাছে থাকবার শখ নেই।'

রমা লজ্জা পেয়ে হাসতে হাসতে সরে যায়, যেতে যেতে বলে যায়, 'মামা, বস, চা এনে দিচ্ছি। যাই যাই কোরো না, খেয়ে দেয়ে ও বেলার লঞ্চে যাবে।'

জীবন ঘাড় ঝাঁকায়: 'সীমা কোথায়?'

লোচন: 'স্কুলে গেছে। তারপর তোমার খবর কি বল?'

জীবন: 'খবর বলতেই তো এলাম। আমার ব্যবসা তেমন ভালো চলছে না। তোমার একটু সাহায্য দরকার।'

লোচন: 'কি রকম সাহায্য চাই বল?'

জীবন: 'কি রকম আর, আমি তো আর তোমার ব্যবসার অংশীদার কালীচরণ নই যে, আমাকে আর একটা আলাদা পুরো ব্যবসার অংশীদার করে দেবে?'

লোচন: 'তার মানে? পুরো আলাদা ব্যবসা মানে?'

জীবন : 'বাহ্, কালীচরণ তো দিলদারপুরে নতুন আড়তের পত্তন করেছে, সবাই জানে তুমিও তার মধ্যে আছ।'

লোচনের চোখে মুখে বিস্ময় ও উদ্বেগ : 'না না, কালীর এ ব্যবসার কথা তো আমি জানি না। কি সব ঘটছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি তো আমাকে ভাবনায় ফেলে দিলে জীবনলাল।'

লোচনের রেখাবহুল মুখে চিন্তার ছাপ।

নিকষ কালো অন্ধকার রাত, চারিদিকে নদী, মাঝখানে দুধপোয়ালির চর।

দুটি খুটনি নৌকা নোঙর করা। দু-একটি আলো জ্বলছে। মাঝিরা সব খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। কালী একটি নৌকার ভিতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে বলে, 'যাকে যাকে পাহারা দিতে বলেছি, তারা সজাগ আছ তো?'

নেপথ্যে : 'আছি আছি।'

সব চুপচাপ হয়ে যাওয়ার পরে, অন্ধকারে অনেকগুলো বাছাড়ি নৌকা খুটনি নৌকা দুটো ঘিরে ফেলে। কিছু লোক লাফিয়ে চরে নামে।

হঠাৎ কয়েকটা মশাল জ্বলে ওঠে, তার সঙ্গে হুংকার, চিৎকার, মাঝিদের প্রহার। মাঝিদের কান্নাকাটি। কেউ জলে লাফিয়ে পড়ে। কেউ চরে ছুট দেয়।

কালী হাত পা বাঁধা অবস্থায় চিৎকার করে : 'আমাকে হাত পা বেঁধে ফেলেছে, বাঁচাও বাঁচাও।' করালী মাঝি ইচ্ছে করেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তুলে নেয়। কম করে পঞ্চাশজনের দল। ডাকাতরা খুটনি নৌকা শূন্য করে, মাঝিদের ভীষণ আহত করে, মুহূর্তেই ঝপ্ ঝপ্ বৈঠা চালিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মণিমহেশপুরে লোচনের গদীতে থানার ও. সি. এসে ঢোকে।

লোচন চমকে ওঠে : 'আসুন বড়বাবু।'

ও. সি : 'আর আসুন! দয়ালপুর থানা থেকে এইমাত্র খবর এসেছে, গত রাত্রে দুধপোয়ালির চরে আপনার দুই নৌকোয় ডাকাতি হয়ে গেছে।'

লোচন : 'ডাকাতি! আবার!' কপালে হাত চাপড়ায়।

কর্মচারিরা তার কাছে ছুটে আসে।

গদীতে কালী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। লোচন শীর্ণ, মুক, টিনের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। কর্মচারীরা যে যার জায়গায় স্থানুবৎ।

লোচন (স্খলিত স্বরে) : 'তারপর?'

কালী মুখ না তুলে : 'তারপর আর কী। আমার কাল ঘুম ভাঙবার আগেই দেখি চার পাঁচজন বণ্ডালোক আমার হাত পা বেঁধে ফেলল— মনে হল যেন চোখের পলকে সব ঘটে গেল।'

লোচন : 'করালী মাঝি কোথায় ছিল?'

কালী : 'তাকে তো ডাকাতরা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। লোচন: 'কালী, অ—
ওঠা বোধ হয় আর সম্ভব না। এখন থেকে জোতজমি যা আছে, তা নিয়েই থাকতে হবে।'

কালী সহসা জবাব দেয় না। একটু পরে বলে, 'এর পরেও কি তুমি সরকারকে এক হাজার মন ধান বেচবে?'

লোচন: 'নিশ্চয়ই, আমি অফিসারকে কথা দিয়েছি।'

কালী: 'তাহলে তোমার অংশ থেকেই তুমি দিও ভাই, আমি পারব না।'

লোচন ব্যথিত, অবাক। ঈষৎ হেসে বলে, 'আমি তো গোড়াতেই তা বলেছিলাম।' বলেই চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, একটা কথা কানে এলো। শুনলাম তুমি নাকি দিলদারপুরে আলাদা আড়তের কারবার খুলেছ?'

কালী হঠাৎ ক্ষিপ্ত: 'কোন্ শালা বলেছে?'

লোচন হেসে: 'আমার শালা।'

কালী: 'তোমার শালা মিথ্যে বলেছে। মেদিনীপুর থেকে হরিহর জানা নামে একজন এসে নতুন আড়ত খুলেছে, আমি দু-একদিন সেখানে গেছি মাত্র।'

লোচন: 'তা হবে। তবে আমার শালা মিথ্যে বলে নি, ভুল বলেছে'। (কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে): 'হ্যাঁ, শোন, গুদামে আমার অংশ থেকেই এক হাজার মন ধান বস্তা বন্দী কর, কালী বাবুর অংশে হাত দিও না।'

কয়েকটা দিন কেটে যায়। লোচন গদীতে বসে রয়েছে। একজন কনস্টেবল ঢোকে: 'লোচনবাবু, আপনাকে বড়বাবু একবার থানায় ডেকেছেন।'

লোচন চমকায়: 'থানায়? আচ্ছা যাচ্ছি।'

লোচন কনস্টেবলের সঙ্গে থানার অফিস ঘরে ঢোকে।

ও. সি : 'এই যে লোচনবাবু, আসুন।'

লোচন টেবিলের কাছে যায়, কিন্তু ও. সি. তাকে বসতে বলে না, ঘরের একপাশে হাত দেখায় : 'দেখুন তো, এ মাঝিদের আপনি চেনেন কি না?'

এক কোণে করালী আর একজন মাঝি হাত বাঁধা অবস্থায় বসে।

লোচন : 'চিনি বৈকি! এরা তো আমারই মাঝি!'

ও. সি. : 'এদের দিয়ে আপনি সরকারের এক হাজার মন চাল পাঠিয়েছিলেন?'

লোচন : 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ও. সি : 'সরকারী বাবুকে মেরে এরা নিজেরাই সরকারের ধান লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

লোচন : 'এরা?'

ও. সি : 'হ্যাঁ, এরা নিজেরাই এজাহার দিয়েছে, সরকারকে এ ধান বিক্রীর ইচ্ছে আপনার ছিল না। আপনি সরকারী বাবুকে মেরে, এদের ধান লুঠ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।'

লোচনের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়; করালীর দিকে ফিরে তাকায় : 'আমি···।'

করালী কুৎসিৎ হাসে : বলে, 'বলেন নি বাবু? আপনার কালীবাবুও সাক্ষী দেবে। আপনিই তো লুঠ করতে বলে, আমাদের ফাঁসিয়েছেন।'

লোচন ও. সি-র দিকে ফিরে তাকায়। ও. সি. গম্ভীর স্বরে বলে, 'আপনাকে এ্যারেস্ট করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।'

লোচন ফিস ফিস করে : 'এ্যারেস্ট! গ্রেপ্তার!'

ও. সি : 'অবিশ্যি বেইল পেয়ে যাবেন, তারপরে কোর্টে লড়ে আপনি—'

লোচন : 'বড়বাবু, আমি কি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারব?'

ও. সি : 'পারবেন, তবে আমার সেপাই আপনার সঙ্গে যাবে।' বলে সে উঠে দাঁড়ায়, 'রাম অবতার, তুমি লোচনবাবুর সঙ্গে যাও, কাজ হয়ে গেলে, থানায় নিয়ে আসবে।' (লোচনকে) 'দেখবেন, লোচনবাবু, পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

লোচনের ফ্যাকাসে করুণ মুখ, বুকে হাত রাখে : 'হায় ভগবান ! এ কোন্ পাপের ফল !' তারপর চুপি চুপি স্বরে বলে ওঠে, 'তবে পালাতে আমাকে হবেই, পালাতেই হবে।'···

লোচন বাড়ি ঢোকে। পিছনে পুলিশ।

রমা দালানে ছিল। লোচনকে দেখে উদ্বেগ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'এ কি বাবা ! তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন ? তোমার সঙ্গে পুলিশ কেন ?'

লোচন নিজের ঘরে যেতে যেতে বলে, 'একটু দরকার আছে, সেপাইকে বসতে দে মা।'

লোচন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে, স্ত্রীর ছবির কাছে দাঁড়ায়, চোখে জল।

সেপাই দালানের চেয়ারে বসে হাতের ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে, 'ও লোচোনবাবু, কী হল ? আধঘণ্টা নিকাল গেল যে !'

রমা দালানে ছটফট করছিল, এবার দরজার কাছে গিয়ে, দরজায় করাঘাত করে : 'বাবা, ও বাবা, তুমি এতক্ষণ ধরে ঘরের ভেতরে কি করছ ?'

কোন জবাব আসে না। রমা সরে আসে, একবার বাইরে যায়। ঝি এবং রাখাল অবাক চোখে দাঁড়িয়ে। রমা রাখালকে বলে, 'কানু,

তুই সীমাকে ইস্কুল থেকে ডেকে নিয়ে আয় তো।' [illegible]
ফিরে আসে, সেপাইকে বলে, 'আপনি কেন বসে আছেন? আপনি থানায় যান, আমি বাবাকে পাঠিয়ে দেব।'

সেপাই মাথা নেড়ে বলে, 'সে হোবার উপায় নেই আছে। লোচোনবাবু ডাকাইতির মতলব দিয়েছে, উস্‌কো হম থানাপর লিয়ে যাব।'

রমা: 'ডাকাতির মতলব? আমার বাবার?' দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জোরে আঘাত করে, চিৎকার করে ডাকে: 'বাবা, বাবা! বাবাগো!'

দরজা খোলে না।

রমা: 'সেপাইজী, তুমি দরজা ভাঙতে পারবে?'

সেপাই উঠে এসে দরজায় জোরে ধাক্কা মারে। তারপরে স-বুট লাথি। শব্দে আশপাশের কয়েকজন এসে পড়ে।

রমা: 'সবাই মিলে দরজা ভাঙো, আমার বাবা ভেতরে রয়েছে, কোন জবাব দিচ্ছে না।'

সমবেত চেষ্টায় ও আঘাতে দরজা ভেঙে পড়ে। দেখা যায় ঘরের ভিতর, কড়িকাঠের সঙ্গে লোচন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

রমার আর্তকান্না: 'বাবা! আমার বাবা গো, আমাদের এভাবে তুমি ছেড়ে গেলে বাবা!'

এই সময়ে সীমা ছুটে আসে। বই ছুড়ে ফেলে দেয়। ঘরে ঢুকে চিৎকার করে পড়ে যায়—'বাবা—আ—আ—আ!'

লোচনের বাড়িতে কালীচরণ দালানে বসে। সময় সন্ধ্যা রাত্র। হ্যারিকেন জ্বলছে দালানে ও ঘরে। ঘরের মধ্যে রমা ও সীমা।

কালীচরণ: 'যাক, পুলিশের হাঙ্গামা, ছেরাদ্দশান্তি সবই মিটে গেল। এখন—'

রমা : ‘কালাকাকা, তুমি কেন আর বসে আছ, বাড়ি

কালীচরণ : ‘সে কি গো রমা, আমি তো ভেবেছি, এখন থেকে এখানেই থাকব। তোমাদের দেখাশোনা করব।’

রমা (কঠিন স্বরে): ‘তার কোন দরকার নেই। আমরা নিজেদের নিজেরাই দেখতে পারব।’

কালীচরণ : ‘তা বললে কী হয়, তোমার এখন সোমত্ত বয়স, ছোট বোন রয়েছে।’

রমা : ‘আমার বয়স তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি বাড়ি যাও।’

কালীচরণ : ‘আহা, আমার নিজের সুখ সাধ বলেও তো একটা কথা আছে। ঘরে আমার বউ নেই—’

রমা : ‘তার মানে ?’

কালীচরণ ঝটিতি ঝাঁপিয়ে পড়ে রমাকে বুকের কাছে চেপে ধরে : ‘তার মানে এই—এখন থেকে তুমি আমার।’

রমা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, ধস্তাধস্তির মধ্যে কালীচরণ তার শাড়ি ছিঁড়ে দেয়। রমার গায়ে কেবল শায়া আর ব্লাউজ।

সীমা পিছন থেকে ছুটে এসে কালীচরণের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দাঁত বসিয়ে দেয়।

কালীচরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, পিছন ফিরে রমাকে ছেড়ে সীমাকে ঠাস ঠাস করে মারে। সীমাও সমানে লড়ে যায়।

রমা এই ফাঁকে বাইরের অন্ধকারে ছুটে যায়। কালীচরণ তা দেখে, সেও বাইরে ছোটে।

সীমা চিৎকার করে : ‘দিদি—দিদি’…

অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে রমা ছুটছে। কালীচরণ তার পিছনে ছুটছে : ‘আমার হাত থেকে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না, এখনো দাঁড়া।’

রমা ভেড়ি বাঁধের দিকে ছোটে, চিৎকার করে : ‘বাঁচাও বাঁচাও !’

সীমাও সকলের পিছনে ছোটে, ‘দিদি—দিদি—!’

রমা ভেড়ি বাঁধের ওপরে। কালীচরণ প্রায় তাকে ধরে ফেলবার উপক্রম করে। রমা দৌড়ে জলের ঢালুতে নামে। কালীচরণও নামে।

অন্ধকারে জলে ঝপাং শব্দ শোনা যায়। প্রথমে একবার, তারপরে আর একবার।

কালীচরণের স্বর ভেসে আসে: 'এই ছুঁড়ি মরবি, কোথায় গেলি।'

দূরের জলে অস্পষ্ট রমা. ডুবে যাচ্ছে।

বাঁধের ওপর সীমা উচ্চ কান্নায় ভেঙে পড়ে: 'দিদি—দিদি তুমি যে সাঁতার জানো না। দিদি গো, দিদি—'

কালীচরণ: 'হারামজাদী ডুবে মরেছে।'

সীমাকে দেখা যায় বাড়িতে ঘরের মেঝেয় পড়ে হু হু করে কাঁদছে। ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছে জীবনলাল মামা: 'সীমু, কাঁদিস না মা, এবার আমার সঙ্গে আমার বাড়ি চল।'

সীমা তথাপি কাঁদে।

মানুষের লোভ লালসা অহংকার মানুষকে কেমন অন্ধ আর নিষ্ঠুর করে তোলে সীমার জীবনীতে সে-কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে আমি এ ঘটনার তুলনা করব না। কিন্তু সমস্ত নিষ্ঠুর হত্যাকাহিনীর পিছনেই আছে মানুষের দুর্বার লোভ। মানুষের শুভাশুভ বোধ তখন হারিয়ে যায়। তখন ঘটনার চরিত্ররা জানতেও পারে না, তারা নিমিত্ত মাত্র। প্রতিটি ঘটনার যা অনিবার্য পরিণতি, তা ঘটবেই।

এখন আর আপনাদের নতুন ঘটনায় নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। সবই আপনারা বুঝে নিয়েছেন। তবু আপনাদের একবার আবার কোর্টরুমে নিয়ে যাব। হত্যার দায়ে সীমার শাস্তির বিচার প্রত্যক্ষ করুন।

আসামীর কাঠগড়ায় সীমার মাথা ঝুলে পড়েছে, কান্নার বেগে শরীর কাঁপছে। সমস্ত ঘর স্তব্ধ। অনেকের চোখে জল।

স্বয়ং বিচারক রুমাল দিয়ে চোখ মোছেন। কিন্তু মুখ গম্ভীর।

শঙ্করের চোখে জল। উকিল আর শম্ভু পাশে নেই। ইতিমধ্যেই তারা উঠে চলে গেছে। শঙ্কর উঠে দাঁড়ায়, সীমার দিকে তাকায়।

সীমা আস্তে আস্তে মুখ তোলে, চোখের জলে গাল ভেজা, চোখ ফোলা, ক্লান্ত: 'হুজুর—এবার যা খুশি শাস্তি আমাকে দিন—আমি খুনী—'

বিচারক: 'সীমা।' তাঁর স্বর কোমল, 'আইনের বিচারে তুমি কি, তা আমি জানি, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারের কথা তিনিই জানেন।'

সীমা: 'ঈশ্বর! হা ঈশ্বর, তোমার রহস্য'—কান্নায় স্বর ডুবে যায়।

বিচারক: 'আমি আমার রায় দিচ্ছি—'

কোর্ট রুম স্তব্ধ কিন্তু চঞ্চল। বিচারক: 'মানবতার বিচারে, সীমাকে শর্তহীন মুক্তি দিতে পারলে আমি সুখী হতাম।...কিন্তু আমি তা পারি না। আইনের সব দিক বিবেচনা করেই আমি এই কথা বলছি। আর আইনে এবং আইনজ্ঞদের সব কিছু বিচার করেই, আমি রায় দিচ্ছি। সীমাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।'

বলেই তিনি নত মুখে বিচারকের ডেস্ক থেকে নেমে গেলেন।

সীমা: 'সাত কেন হুজুর? সারা জীবন নয় কেন? পৃথিবীতে আমার আর কী আছে, কে আছে?'

ভারপ্রাপ্ত অফিসার আসামীর কাঠগড়া থেকে সীমাকে নামিয়ে কোর্টরুমের বাইরে নিয়ে যায়।

শঙ্কর ছুটে আসে: 'সীমা, সীমা, পৃথিবীতে এখনো তোমার জন্য আমি আছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, সীমা, আমি। আমি যে কিছুই জানতাম না।' তার চোখে জল।

সীমা হাত বাড়িয়ে শঙ্করের চোখের জল মুছিয়ে দেয়: 'ওগো তুমি কেঁদো না। আমি জানতাম না, এ হতভাগীর জন্য কাঁদবার এখনো কেউ আছে। তুমি কাঁদলে আমি বুক বেঁধে জেলে যেতে পারব না।'

শঙ্কর সহসা দু'হাতে সীমাকে জড়িয়ে ধরে, 'সীমা সীমা!'

অফিসার: 'আর দেরি করা যায় না।'

সীমা আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে শঙ্করের দু'পায়ে প্রণাম করে।

'সীমা, সাত বছর রোজ জেল গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকব আমি।'

সীমার মূর্তি সরে যেতে থাকে। শঙ্করও চলতে থাকে।

সীমা: 'সাত বছর ধরে...'?

শঙ্কর পাশে চলতে চলতে ফিসফিস করে বলে, 'হ্যাঁ, সাত বছর আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব সীমা—'

সীমা দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। যেন অনেক দূর থেকে এক অলৌকিক স্বর ভেসে আসে—'ফিরে আসব তোমার কাছে'—।